শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

উৎসর্গ

আমার বিকশিত হবার পেছনে যার অবদান অনেক বেশি
যিনি নিরবে-নিভৃতে আমার কথা দোআর মাঝে স্মরণ করেন
আমার সেই পরমপ্রিয় উস্তায
মাওলানা আহমাদ ঈসা সাহেবের দীর্ঘ নেক হায়াত কামনায়

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনি আমাদেরকে তৌফীক দিয়েছেন, এজন্য আমরা কিছু কাজ করতে পারছি। এ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। আল-হামদু লিল্লাহ, সেগুলো মানুষের উপকারে আসছে বলে কিছু নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।

সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা নতুন আরেকটি পুস্তক পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি। পুস্তকটি লিখেছেন, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তি, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। তিনি সৌদী আরবের উমর ইবনে আবদুল আজিজ জামে মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তা ছাড়া তিনি একজন বিশিষ্ট দাঈ। বিভিন্ন পন্থায় দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন। দাওয়াতের আধুনিক যত পদ্ধতি হতে পারে, সেগুলো তিনি সবই অবলম্বন করছেন এবং দিনরাত মেহনত করে চলছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মেহনত কবুল করুন এবং তাঁর হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন।

বক্ষ্যমাণ পুস্তক তিনি সবশ্রেণির লেখক, পাঠক, প্রকাশকের উদ্দেশ্যে লিখেছেন। এতে তিনি বই পড়ার পদ্ধতিগত নানান দিক অত্যন্ত সহজ-সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। আমরা পুস্তকটি অনুবাদ করে বাঙালি মুসলমানদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মেহনত কবুল করুন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দিন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
১৫/০৬/১৪৩৮ হিজরী (১৫/০৩/১৭ ইং)

অনুবাদকের কথা

শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ বর্তমান আরব বিশ্বের খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় আলেমদের অন্যতম। তার রচিত 'কাইফা তাকরাউ কিতাবান' বেশ বিখ্যাত একটি গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে তিনি বই পড়ার পদ্ধতিগত নানান দিক অত্যন্ত সহজ-সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। যা একজন পাঠকের বইপাঠকে অনেক সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসু করে তুলতে সহায়তা করবে।

অনেকেই আমরা বই পড়ার প্রতি আগ্রহ পাই না। বই হাতে নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্যের বিরক্তি এসে ভর করে আমাদের উপর। আবার অনেকের ভেতর বই পড়ার প্রতি আগ্রহ থাকলেও বই নির্বাচনে ভুল করায় কিংবা পাঠ-পদ্ধতিতে ভুল থাকায় অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আগ্রহ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এছাড়াও অধিকাংশ পাঠকই জানেন না বইপাঠের সময় কোন কাজগুলো গুরুত্বের সাথে করতে হয় আর কোন কাজগুলো বর্জন করতে হয় ইত্যাদি। এসব বিষয় বিবেচনা করে বইটি পড়ার পর মনে হয়েছিল এটি অনূদিত হয়ে বাঙলাভাষী পাঠকদের সামনে আসা দরকার। সেই সুবাধে আমি অল্প অল্প করে অনুবাদ করা শুরু করি।

অনুবাদ চলাকালীন বিষয়টি আমি হুদহুদ প্রকাশনের মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইনকে জানালে তিনি বইটির প্রতি তার ও তার প্রকাশনীর পূর্ব থেকে পোষণ করা আগ্রহের কথা জানান। সেই সাথে বইটি তাদের প্রকাশের পরিকল্পনা আছে বলেও আমাকে অবগত করান। পরবর্তীতে তার উৎসাহের সুবাধে অনুবাদের গতি আরো তরান্বিত হয়। নিজস্ব পড়াশোনা আর ব্যস্ততার ভেতর দিয়েই একটা সময়ে অনুবাদকর্মটি শেষ হয়।

বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমরা মূল আরবী ও তার সাথে এর ইংরেজী সংস্করণও পাশে রেখেছি। দুই এক জায়গায় আরবীর পরিবর্তে ইংরেজী সংস্করণের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। বিশেষত যেসব বিষয় বাঙলাভাষী পাঠকদের জন্য প্রয়োজন নেই সেসব বিষয়ে ইংরেজী সংস্করণকে প্রধান্য দিয়েছি। এরমধ্যে আরবী ব্যাকরণের কিছু বিষয়ও রয়েছে।

বইটিতে বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলো আমরা কাব্য আকারে বাঙলায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সে কারণে হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব হয় নি। কিছু জায়গায় ভাবার্থের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। পড়ার সময়ই অভিজ্ঞ পাঠক সেটা বুঝতে পারবেন।

অনুবাদকে প্রাঞ্জল ও সাবলীল রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে আমরা ত্রুটি করি নি। আমাদের সর্বোচ্চ শ্রমটাই আমরা এতে ঢেলে দিয়েছি। তবে সে চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে সে সিদ্ধান্ত রইলো পাঠকের হাতে।

বইটিকে সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করে পাঠকের হাতে তুলে দেবার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টার কোন কমতি ছিল না। তারপরেও মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধে নয় তাই আমাদের অজান্তে কিছু ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক।

পাঠকের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন থাকবে, এমন কিছু গোচরীভূত হলে আমাদের অবহিত করানোর জন্য। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নিবো।

বইটি প্রকাশের মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করায় হুদহুদ প্রকাশনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রকাশের জন্য বইটি নির্বাচন করে বরাবরের মতোই তারা তাদের পরিশীলিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। সেইসাথে আরো যারা কোন না কোনভাবে বইটি অনূদিত হওয়া থেকে নিয়ে পাঠকের হাতে আসা পর্যন্ত দীর্ঘ কর্মসম্পাদনের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতিও রইলো কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন। সেই সাথে বইটিকেও কবুল করে নিন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
২৭.০২.১৭

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে বলেছেন, তুমি লেখো। তখন সে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিপিবদ্ধ করলো। সমস্ত কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্য স্বীকৃত। তিনি কলম ও লেখার নেয়ামত প্রদান করার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে তিনি ইরশাদ করেছেন–

نٓ وَالْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ﴿١﴾

অর্থাৎ, 'নুন, কলমের ও তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার কসম।'

[সুরা কলম : ১]

এই কসমই কলম ও লেখার মর্যাদার কথা প্রমাণ করে। কারণ আল্লাহ তাআলা মর্যাদাকর জিনিসেরই কেবল কসম করে থাকেন।

বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার অন্যতম একটি অনুগ্রহ হল, বাকশক্তি প্রদান। যে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন–

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

অর্থাৎ, 'তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।'

[সুরা আর-রহমান : ৩-৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেছেন–

'অতপর মানুষের উপর আল্লাহ তাআলার দুই ধরনের বর্ণনাশক্তি প্রদানের অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করুন। একটি হল, লেখনী শক্তি আরেকটি হল বাকশক্তি।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হওয়া প্রথম

সুরাতে তিনি ইরশাদ করেছেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

অর্থাৎ, 'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন। আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।' [সুরা আলাক : ১-৫]

তারপর তিনি বলেন, 'কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার সবচে' বড় অনুগ্রহ। কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষাটা স্থায়ীত্ব লাভ করে। অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ওসীয়তের কথা জানা যায়। সাক্ষ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। মানুষের মাঝে সম্পাদিত বিভিন্ন লেনদেনের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়।

অতীত যুগের ঘটনাবলী পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষরণ করা যায়। যদি লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা না থাকতো তবে এক যুগের ঘটনাবলী অন্য যুগের লোকেরা আর জানতে পারতো না। সুন্নাহ বিলীন হয়ে যেত, হুকুম-আহকাম সব হারিয়ে যেত। পরবর্তীরা পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হতে পারতো না। সবচে বড় ক্ষতি হত ধর্মের। কারণ তখন বিস্মৃতি আস্তে আস্তে মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে ধুয়ে মুছে দিত। সুতরাং এই লেখনী ব্যবস্থাই মানুষের

জন্য বই-পুস্তককে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছ, যেভাবে মজবুত পাত্র মূল্যবান বস্তুকে হারিয়ে যাওয়া ও নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। সুতরাং কুরআনের নেয়ামতের পর কলমের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হল আল্লাহ তাআলার সবচে বড় অনুগ্রহ।

[মিফতাহু দারিস সাআদাহ : ১/২৭৭]

যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে লেখা শিক্ষা দিয়েছেন তিনিই আবার তাকে কথা বলাও শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে সে কথা বলতে সক্ষম হয়েছে। তিনি তাকে এমন হৃদয় দান করলেন যা দ্বারা সে অনুধাবন করতে পারে। এমন জিহ্বা দান করলেন, যা দ্বারা সে ভাষান্তর করতে পারে। এমন আঙ্গুল দিলেন, যার দ্বারা সে লেখতে পারে। কলমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করার এমন বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা উদাসীন। সুতরাং লেখনী বিদ্যা নিয়ে আপনি সামান্য চিন্তা করুন। নিজের অবস্থা নিয়েও ভাবুন। আপনি নির্জীব কলম হাতে তুলে নিয়ে নির্জীব কাগজের উপর রাখতেই সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রজ্ঞার প্রস্রবণ এবং নানান প্রকারের কাব্য-গদ্য ও জিজ্ঞাসার জবাবের ঝর্ণাধারা বইতে শুরু করে। [প্রাগুক্ত : ১/২৭৮]

১৩

আল্লাহ আআলা পবিত্র কুরআনের মতো মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে তা পড়ার প্রতি উৎসাহীত করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. বিশাল বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা পবিত্র কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের ইলম ছিল তাদের বক্ষে। সেটাই ছিল তাদের ইলমের ভাণ্ডার। প্রথম দিকে তারা হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন না। বরং মৌখিকভাবে তার প্রচার করতেন এবং অন্যদের থেকে মুখস্থ গ্রহণ করতেন। তাদের আশংকা ছিল হাদীস লিপিবদ্ধ করা হলে সেটা কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়টি তাদের মুখস্থশক্তিতেও প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু যখন কুরআন লোকদের বক্ষে পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়ে গেল এবং মানুষেরা তা আয়ত্ব করে নিল এবং হাদীসের সনদ দীর্ঘ হয়ে গেল, মুখস্থশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো তখন তারা হাদীস লিপিবদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তখনই সুন্নাহ সংকলিত হল। বই-পুস্তকে ইলম সংরক্ষিত হলো। যেমনটি অনেক মনীষী বলেছেন যে, ইলমকে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করো।

[তাকয়ীদুল ইলম : ৬৯]

ইলম লিপিবদ্ধ করা জায়েয হওয়ার বিষয়টি যে আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় তা হল–

وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا

অর্থাৎ, 'তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না। চাই তা ছোট হোক কিংবা বড়। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এই লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক প্রতিষ্ঠিত রাখে। সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত।'

[সুরা বাকারা : ২৮২]

আল্লাহ তাআলা সতর্কতাস্বরূপ সংশয়-সন্দেহে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবার উদ্দশ্যে ঋণের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রাখার আদেশ দিয়েছেন। আর ঋণের তুলনায় ইলম অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তাকে সংশয়-সন্দেহের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে লিখে রাখার বৈধতা তো আরো জোরদারভাবে প্রমাণিত হয়।

কী পড়বেন কীভাবে পড়বেন

মুসলিম মনীষীদের কাছে বই পড়ার গুরুত্ব

উলামায়ে কেরামের হৃদয়ে ইলমী বই-পুস্তকের প্রতি অনুরাগ ছিল। বই ছিল তাদের এমন বন্ধু, যে কখনও বিরক্ত করে না। সফরে তাদের সাথে থাকে। নিঃসঙ্গতার সময়ে সঙ্গ দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহ. কে বলা হল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! কেন তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে বের হয়ে তাদের সঙ্গে বসো না?'

তিনি বললেন, 'আমি যখন ঘরে থাকি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের সঙ্গেই থাকি।' অর্থাৎ তাদের বই-পুস্তক পড়ি।

শফীক ইবনে ইবরাহীম বলখী রাহ. বলেন, 'আমরা ইবনুল মোবারককে বললাম, তুমি তো আমাদের সাথেই সালাত আদায় করো। তাহলে আমাদের সাথে বসো না কেন?' তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে সাহাবা ও তাবেয়ীদের সাথে বসি।' আমি বললাম, 'সাহাবা-তাবেয়ীদের আবার তুমি কই পেলে?' তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ইলমের প্রতি মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে কি করবো? তোমরা তো বসেই মানুষের দোষচর্চা

করা শুরু করো!' [তাকয়ীদুল ইলম : ১২৬]

ইবনে শিহাব যুহরী রাহ. প্রচুর গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। সারাদিন তিনি সেগুলো নিয়েই পড়ে থাকতেন। ফলে তাঁর স্ত্রী একদিন তাকে বলেই ফেললেন, 'আল্লাহর কসম! তিন সতিন থাকার চেয়েও এসব বই আমার জন্য বেশি যন্ত্রণাদায়ক।' [সাজারাতুয যাহাব : ১/১৬৩]

পূর্ববর্তী মনীষীদের কাউকে প্রশ্ন করা হল, 'কে আপনাকে নির্জনে সঙ্গ দেয়?' তিনি তার গ্রন্থাবলীর দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বললেন, 'এগুলো'। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, 'আর মানুষের মধ্যে?' তিনি বললেন, 'যারা এর ভেতর আছে তারা।' [তাকয়ীদুল ইলম- ১২৫]

পূর্ববর্তী মনীষীরা সর্বাবস্থায় পড়তেন। ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন, 'আমি এক ব্যক্তিকে চিনি, যার প্রচণ্ড জ্বর ও মাথাব্যথার অসুখ হয়েছিল। তার সিথানের পাশে একটা বই থাকতো। যখন সে কিছুটা হুশ ফিরে পেতো তখনই পড়া শুরু করে দিতো। আবার অসুখ বেড়ে গেলে তা রেখে দিতো। একদিন ডাক্তার এসে তার এই অবস্থা দেখে বললেন, 'এমন করাটা আপনার জন্য ঠিক হচ্ছে না।' [রওজাতুল মুহিব্বীন-৭০]

হাসান ইবনে লু'লু রাহ. বলেন, 'আমার চল্লিশটা বছর এমন কেটেছে যে, বুকের উপর একটা বই রেখে আমি ঘুমিয়েছি ও ঘুম থেকে উঠেছি।'[জামিউ বায়ানিল ইলম- ২/২০৩]

তাদের কারো কারো অবস্থা এমন ছিল যে, তারা বিছানার পাশে বেশ কিছু বই রাখতেন। যাতে ঘুমের আগে ও ঘুম থেকে উঠার পরে সেগুলোর প্রতি নজর বুলাতে পারেন।

[তাকয়ীদুল ইলম- ১২৪]
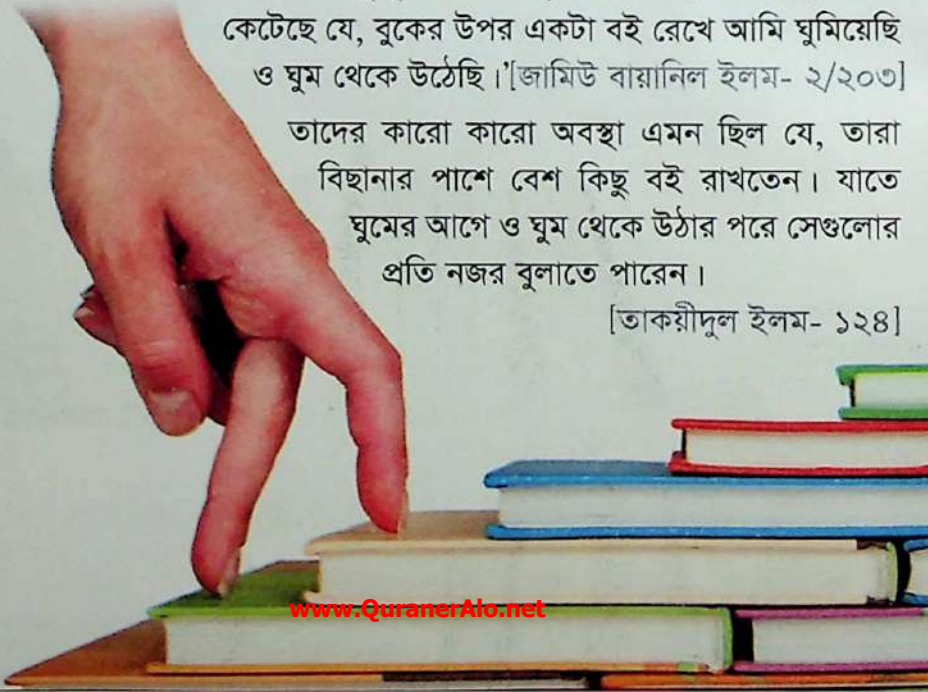
খতীব বাগদাদী রাহ. যখনই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন তার হাতে ছোট একটা পুস্তিকা রাখতেন এবং হাঁটতে হাঁটতেই সেটা পড়তে থাকতেন। অনেক আলেমদেরকে কেউ দাওয়াত করলে তিনি শর্তারোপ করতেন, তার জন্য একটা আলাদা জায়গা রাখতে হবে। সেখানে কিছু বইয়েরও ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে তিনি সেখানে যাবার পর বই পড়তে পারেন। [আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম- ৪০]

অনেক সময় পড়ার জন্য রাখা চেরাগ থেকে তাদের কারো কারো পাগড়ির প্রান্তভাগে আগুন লেগে যেত। কিন্তু তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত টের পেতেন না যতোক্ষণ না তাদের কিছু চুল পুড়ে যেতো।

আবুল আব্বাস মুবাররাদ রাহ. বলেন, 'আমি তিন জনের চেয়ে বেশি বইয়ের প্রতি আগ্রহী আর কাউকে দেখি নি। একজন হল জাহেয। সে বেদআতি মুতাযিলা দলভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয়জন ফাতাহ ইবনে খাকান। তৃতীয়জন কাজী ইবরাহীম ইবনে ইসহাক। জাহেযের হাতে কোন বই আসলেই তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঝটপট পড়ে ফেলতেন। চাই সেটা যেমন বই-ই হোক না কেন। আর ফাতাহ ইবনে খাকান তার মোজার ভেতর বই বয়ে বেড়াতেন। যখনই মুতাওাক্কিলের সামনে থেকে পস্রাব করার জন্য কিংবা সালাত আদায় করার জন্য উঠে যেতেন তখন বই বের করে গন্তব্যস্থল আসা পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে বইটি দেখতে থাকতেন। ফেরার পথেও তিনি একই কাজ করতেন। আর ইসমাইল ইবনে ইসহাকের কাছে আমি যখনই গিয়েছি, দেখেছি
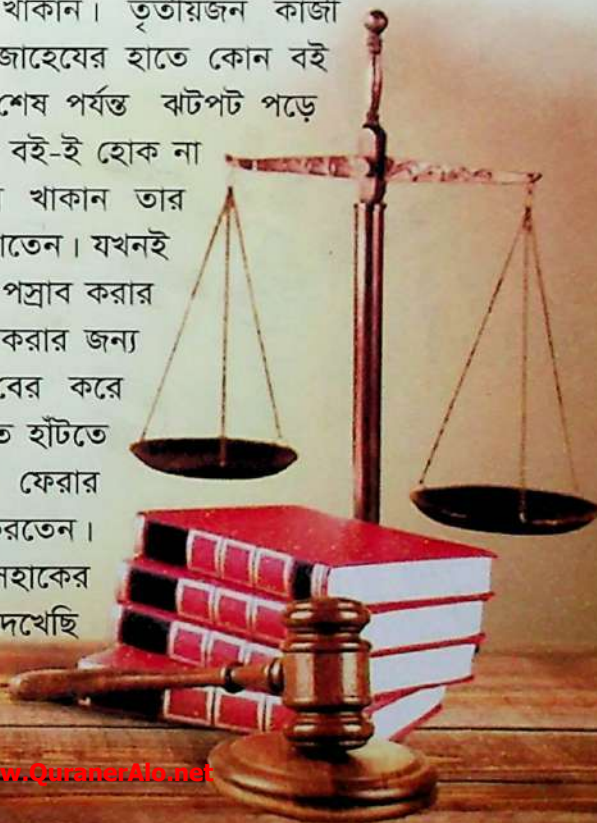
তিনি হাতে থাকা কোনো বই পড়ছেন কিংবা পড়ার জন্য বই তালাশ করছেন। [তাকয়ীদুল ইলম-১৪০]

বই সংগ্রহ করা ও সেগুলো পড়ার প্রতি পূর্ববর্তী মুসলিম উলামায়ে কেরামের প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। ইবনুল জাওযী রাহ. বলেন, 'আমি নিজের ঘটনা বলি। কখনোই আমি বই পড়ে পরিতৃপ্ত হই নি। যদি এমন কোন বই পেতাম যা আগে কখনও দেখি নি তাহলে মনে হতো যেন আমি গুপ্তধন পেয়েছি। আমার বিশ হাজারেরও বেশি বই পড়া হয়েছে তবুও আমি নতুন বইয়ের তালাশে থাকি।' [সয়দুল খাতির-১৪৯]

পূর্ববর্তী মনীষীরা বইপুস্তক সংগ্রহের পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করতেন। অনেকে তো সব টাকাপয়সা এর জন্যই বিলিয়ে দিতেন। একবার কারো স্ত্রী তাকে বেশি বেশি বই কেনার কারণে তিরস্কার করে বলেছিলেন–

وَ قَائِلَةٌ اَنْفَقْتَ فِي الْكُتُبِ مَا حَوَتْ * يَمِيْنُكَ مِنْ مَالٍ فَقُلْتُ دَعِيْنِيْ

لَعَلِّيْ أَرَي فِيْهَا كِتَابًا يَدُلُّنِيْ * لِآخُذَ كِتَابًا آمِنًا بِيَمِيْنِيْ

মায়াবতী স্ত্রী ডাক দিয়ে বলে, বই কিনে সব টাকা ফেলে দিলে জলে!

বললাম, আরে ছাড়ো, কিনেছি তো বই; এর মাঝে লাভ ছাড়া ক্ষতি আছে কই!

ফাইরুযাবাদী রাহ. পঞ্চাশ হাজার মিসকাল স্বর্ণের সমপরিমাণ বই কিনেছিলেন। কোথাও সফরে বের হলে সেসব কিতাবের বিরাট বড় বোঝা তার সাথে থাকতো। কোথাও বিরতি দিলে তিনি সেগুলো পড়তেন।

[আলদওউল লামে- ১০/৮১]

কোন কোন আলেম জামা তৈরি করার সময় বইয়ের কথা মাথায় রাখতেন। ইমাম আবু দাউদ রাহ. এর জামার মধ্যে একটা বড় আরেকটা ছোট আস্তিন থাকতো। তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'বড়টা বইয়ের জন্য। আর ছোটটার তেমন দরকার পড়ে না।' [তাযকিরাতুল হুফফাজ- ২/৫৯২]

অনেকের কাছে বইয়ের বিশাল বড় ভাণ্ডার থাকতো। সেখানে প্রত্যেক বইয়ের তিনটা করে কপি থাকতো। বইয়ের প্রতি তাদের এতো বেশি গুরুত্ব ছিল যে, তারা এমন অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে একজন ছাত্র বইয়ের সঙ্গে কিভাবে শিষ্টাচার বজায় রাখবে, কিভাবে বই কপি করবে, কলম-কালি ও তার রঙ নির্বাচন করবে, কিভাবে বইয়ের যত্ন নিবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বই-পুস্তকের বৈশিষ্ট্য

বই হল সৎ প্রতিবেশী। বিনয়ী শিক্ষিক। অনুগত সঙ্গী। যে কখনও আপনার বিরুদ্ধে যাবে না। আপনি কখনও এমন কোন শিক্ষককে দেখেছেন, যে তার ছাত্রের সামনে বিনীত হয়? বই কিন্তু এমন শিক্ষক, যে তার পাঠকের সামনে বিনীত হয়। এটি এমন এক দীর্ঘস্থায়ী বৃক্ষ, যা সর্বদা ফল দিতে থাকে। সুন্দর সুন্দর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়, অতীত কালের হারানো ঘটনাবলী এবং দূর-দূরান্তের দেশের চিত্র তুলে ধরে। মন-মননে আলো ছড়ায়। মেধাকে শাণিত করে। জানার পরিধিকে প্রশস্ত করে। সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করে। একাকীত্ব কাটিয়ে তোলে। উপকার বয়ে আনে। এর বিনিময়ে

সে কিছু গ্রহণ করে না। শুধু দিয়েই যায়। এর পরিবর্তে কিছু নেয় না। কবি বলেন–

نِعْمَ الْأَنِيْسُ إِذَا خَلَوْتَ كِتَابٌ * تَلْهُوْ بِهِ إِذَا خَانَكَ الْأَصْحَابُ
لَا مُفْشِيًا سِرًّا إِذَا اسْتَوْدَعْتَهُ * وَ تُنَالُ مِنْهُ حِكْمَةٌ وَ صَوَابٌ

বই তোমার ঘনিষ্ঠজন; একা হবার কালে, সে-ই বিনোদন বন্ধুরা সব; ফাঁসায় যখন জালে।

ফাঁস করে না গোপন কথা; যখন বলো তাকে, প্রজ্ঞা-ন্যায়ের চিত্র তোমার চিত্ত-পটে আঁকে। [তাকয়ীদুল ইলম-১২০]

আবু বকর আল কফফাল বলেছেন–

خَلِيْلِيْ كِتَابِيْ لَايَعَافُ وِصَالِيَا * وَ إِنْ قَلَّ لِيْ مَالٌ وَ وَلَّى جَمَالِيَا
كِتَابِيْ أَبٌ بِرٌّ وَ أُمٌّ شَفِيْقَةٌ * هُمَا هُوَ، إِذْ لَا أُمَّ أَوْ أَبَا لِيَا
كِتَابِيْ جَلِيْسِي لَا أَخَافُ مَلَامَهُ * مُحَدِّثُ صِدْقٍ لَا يَخَافُ مَلَالِيَا
مُحَدِّثُ أَخْبَارِ الْقُرُوْنِ الَّتِيْ مَضَتْ * أَرَي تِلْكَ الْقُرُوْنَ الْخَوَالِيَا
كِتَابِيْ بَحْرٌ لَا يَغِيْضُ عَطَاؤُهُ * يُفِيْضُ عَلَي الْمَالِ إِنْ غَاضَ مَالِيَا
كِتَابِيْ دَلِيْلٌ عَلَي خَيْرِ غَايَةٍ * فَمِنْ ثَمَّ إِدْلَالِيْ وَ مِنْهُ دَلَالِيَا
إِذَا زِغْتُ عَنْ قَصْدِ السَّبِيْلِ أَقَامَنِيْ * وَ إِنْ ضَلَّ ذِهْنِيْ رَدَّنِيْ عَنْ ضَلَالِيَا

বইকে আমি বন্ধু ভাবি; সাক্ষাতে তার আগ্রহ পাই, সম্পদ আমার যদিও

কম রূপ-শোভাও তেমনটা নাই।

বইকে আমি পিতা ভাবি; স্নেহময়ী মাতাও সে-ই, তাকেই আমি দু'জন মানি; কারণ আমার মা-বাবা নেই।

বইকে আমি সঙ্গী ভাবি; তার নিন্দার শঙ্কা নাই, সত্য কথা বলে সদা; নিন্দা লোকে করুক যা-ই।

অতীত যুগের খবরাখবর; আমায় প্রদান করে থাকে, গত হওয়া যুগ যামানার; অসাধরণ চিত্র আঁকে।

বইকে আমি সাগর ভাবি; তার দানে-তে কমতি নাই, সম্পদে মোর ঘাটতি এলে; তার অনুদান পাশে পাই।

যখন আমি বিচ্যুত হই; সঠিক দিশা থেকে, সে আমাকে সংশোধিয়ে; সঠিক পথে আনে।

যদি আমার স্খলন ঘটে; ভ্রান্ত হয়ে পড়ি, সে-ই আমাকে ফিরিয়ে আনে; যতোই দূরে সরি। [প্রাগুক্ত]

আবু আইউব আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে শুজা তার এক খাদেমকে আবু আবদুল্লাহ ইবনুল আরাবির কাছে পাঠালেন এই মর্মে যে, তিনি যাতে তার কাছে আসেন। খাদেম তার কাছে ফিরে এসে জানালো, ‘আমি তাকে আসার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জানালেন, আমার কাছে কয়েকজন গ্রাম্য লোক রয়েছে। তাদের সাথে আমার প্রয়োজন শেষ হলে আসবো।’ খাদেম জানালো, ‘তার কাছে আমি কাউকে দেখলাম না। তবে সামনে থাকা কিছু বইয়ের প্রতি নজর বুলাতে দেখলাম। তিনি একবার
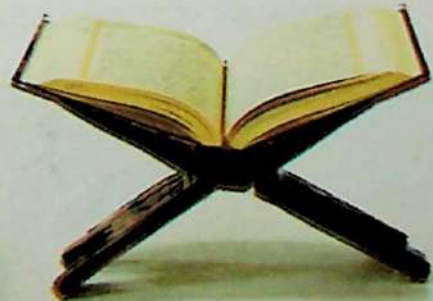
এই বই আরেকবার ওই বই দেখছেন।' এর কিছুক্ষণ পরেই আবু আইউব তার কাছে আসলেন এবং বললেন, 'হে আবু আবদুল্লাহ, কী আশ্চর্য! আপনি আমাদের থেকে আড়ালে থেকে আপনার সান্নিধ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন। খাদেম আমাকে জানালো যে, আপনার কাছে সে কাউকে দেখে নি। অথচ আপনি বলেছেন, আমি কিছু গ্রাম্য লোকের সাথে আছি। তাদের সাথে প্রয়োজন শেষ হলেই আসবো।'

তখন ইবনুল আরাবি কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন–

لَنَا جُلَسَاءُ مَا نَمِلُّ حَدِيْثَهُمْ * أَلِبَّاءُ مَامُوْنُوْنَ غَيْبًا وَ مَشْهَدًا
يُفِيْدُوْنَنَا مِنْ رَأْيِهِمْ عِلْمَ مَا مَضَي * وَ عَقْلًا وَ تَأْدِيْبًا وَ رَأْيًا مُسَدَّدًا
فَإِنْ قُلْتُ مَوْتَي فَلَسْتُ بِكَذَّابٍ * وَ إِنْ قُلْتُ أَحْيَاءُ فَلَسْتُ مُفَنَّدًا

মোদের কিছু বন্ধু আছে; যারা অনেক জ্ঞানী, লক্ষ্যে কিবা অলক্ষ্যে-তে; বিশ্বস্ত তাদের মানি।

অনেক কিছুই শেখায় তারা; বিষয় অতীত কালের, আরো শেখায় ভদ্রতা ও; দীক্ষা সত্য রায়ের।

যদি বলি মৃত তারা; মিথ্যুক আমি নই, জীবন্ত-ও বলি যদি; সত্যবাদী-ই হই। [জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী ২/২০২]

বই ভালো বন্ধু। উত্তম পাথেয়। একাকী মুহূর্তের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। সে অজানা দেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আপনি চাইলে তার অদ্ভুত কথামালা শুনে হাসতে পারেন। আবার চাইলে তার বিরল সব তথ্যের সাথে পরিচিত হয়ে আশ্চর্যান্বিত হতে পারেন। যদি আপনি চান তাহলে তার মজার মজার ঘটনা পড়ে বিনোদিত হতে পারেন। আবার তার উপদেশাবলী পড়ে মুগ্ধও হতে পারেন।

সে আগে-পরের ও প্রকাশ্য-গোপন অনেক বিষয়ই সংকলিত করে রাখে আপনার জন্য। যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের নিয়ে কথা বলে। জীবিতদের জীবনালেখ্য তুলে ধরে। কখনও আপনাকে ধোঁকা দেয় না। কপটতার আশ্রয় নেয় না। মিথ্যার মাধ্যম গ্রহণ করে না। বই এমন এক বন্ধু, যদি আপনি তাকে অধ্যয়ন করেন তবে সে আপনাকে দীর্ঘ উপকার প্রদান করবে। আপনার প্রকৃতিকে শাণিত করবে। ভাষাকে শক্তিশালী করবে। প্রকাশভঙ্গিকে সুললিত ও পরিমার্জিত করবে। এক মাসে তার মাধ্যমে আপনি এতো কিছুর সাথে পরিচিত হতে পারবেন যা লোকদের থেকে এক যুগেও পারা সম্ভব নয়।

বই এমন এক বন্ধু, যে রাতের বেলাতেও দিনের মতোই আপনার অনুগত থাকে। ভ্রমণেও ঠিক সেভাবেই আপনার অধীনস্ত থাকে, যেভাবে থাকে অ-ভ্রমণে। সে কখনও ঘুমে আক্রান্ত হয় না। ভ্রমণের ক্লান্তিও কখনও তাকে স্পর্শ করে না।

বই স্থান-কালের ভেদাভেদ এবং সীমানা ও মানচিত্রের ব্যবধান বুঝে না। ফলে পাঠক চাইলেই বইয়ের ভেতর দিয়ে যে কোন যুগে ফিরে যেতেন পারেন। যে কোন শহর-বন্দরে ও রাজ্যে-সম্রাজ্যে ঘুরে আসতে

পারেন। বড় বড় ক্ষণজন্মা মনীষীদের স্নেহধন্য সংস্পর্শ পেতে পারেন। তাদের কর্মযজ্ঞের সাথে পরিচিত হতে পারেন।

আপনি একজন মুসলিমের অবস্থা কল্পনা করুন, যখন সে কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন নবীদের ঘটনা পড়তে থাকে তখন আসলে সে বহুদূর দেশে অবস্থান করেও দীর্ঘ সময়ের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সেই যুগে গিয়ে উপস্থিত হয়। সে ঘটনাগুলো এমনভাবে পড়তে থাকে যেন সে তাদের সাথেই বসবাস করছে। সে একে একে দেখতে থাকে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, নূহ, দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা, হারূন, যাকারিয়া, ইয়াহয়া, ঈসা, ইলয়াস, ইসমাঈল, ইয়াসাআ', ইউনুস, লূত প্রমুখ নবীগণের ঘটনাবলী। যেগুলোর চিত্র কুরআন-সুন্নাহতে আলোচিত হয়েছে। ঘটনাগুলো পড়ার সময় মনে হতে থাকে আমরা যেন তাদের সাথেই বসবাস করছি। সুতরাং এই নিআমত নিয়ে একটু চিন্তা করুন।

বইয়ের মাধ্যমেই সেগুলো আমরা পাচ্ছি। সুতরাং বই আমাদের কতো বড়ো উপকারী বন্ধু তা এর মাধ্যমে সহজেই বুঝে আসে।

আমরা কেন বই পড়বো?

একজন মুসলিম বেশ কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বই পড়ে। সেগুলো হল–

১। নেকী অর্জন করার জন্য। যেমন কুরআন পড়া।

২। শরীয়তের জ্ঞান অর্জন ও দ্বীনী বিষয়ে গভীর অবগতি লাভ করার জন্য।

৩। বারবার পড়া হয় মুখস্থ করার জন্য।

৪। কাফেরদের চক্রান্ত জানা এবং মুনাফিক ও বাতিলপন্থীদের সংশয়-সন্দেহ সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য।

৫। ভাষা-সৌকর্য বৃদ্ধি ও পার্থিব উপকারী বিষয়ের জ্ঞান লাভের জন্য।

৬। ভ্রান্ত বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য। কারণ অন্তর এমন জিনিস, যাকে ইবাদাতের মাঝে ব্যস্ত না রাখলে সে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৭। আত্মিক প্রশান্তি ও বৈধ বিনোদন লাভের জন্য।

এ ছাড়াও আরও অনেক দ্বীনি ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমরা বই পড়ে থাকি।

জাহেল সমাজ সেই জাতিকে সুসভ্য বলে দাবি করে, যার বড় একটা অংশ বইপাঠে অভ্যস্ত। তারা কি ধরনের বই পড়ছে সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। জাহেল সমাজ ব্যবস্থার লোকেরা বলে থাকে,'পড়া শুধুই পড়ার জন্য'।

তারা পড়াকেই মূল উদ্দেশ্য বানিয়েছে। ফলে বাছ-বিচার ছাড়া যা সামনে পায় তা-ই পড়ে। কিন্তু একজন মুসলিমের কাছে পড়াটা হল মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছার একটা মাধ্যম। আর সেটা হল, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। তাই সে আলেম-ওলামাদের সাথে টেক্কা দিতে কিংবা অজ্ঞদের সাথে তর্ক করতে অথবা মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য পড়ে না। কারণ যে এমনটি করবে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অন্যদের ভুল-ত্রুটি পর্যবেক্ষণ করা কিংবা তাদের পদস্খলন ও ভ্রান্তি অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যেও একজন মুসলিম বই পড়ে না।

কারণ এতে ইখলাসের অভাব থাকে।

একজন মুসলিম এমন বইপত্রও পড়ে না, যার মাঝে তার দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন ধরনের ফায়দা নাই। কারণ তার সময় এরচে আরও অনেক বেশি দামি।

বর্তমান সময়ে আমরা যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই ভিন্ন চিন্তাচেতনার মানুষদের বইপত্র পড়ার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এর ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজে তৈরি হচ্ছে চরিত্রহীন শ্রেণির পাঠকগোষ্ঠী। যারা ইসলামের শত্রুদের আক্রমণকে আরও প্রসারিত করছে। কারণ এই ধরনের পাঠক পড়ার ক্ষেত্রে ভালমন্দের বাছ-বিচার করে না। ফলে সে এমন জিনিসও শিখে, যা তাকে ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার করতে পারে না। সে ওইসব বইও পড়ে, যা ইসলামের শত্রুরা রচনা করেছে। পরবর্তীতে সেগুলো আবার সে মানুষের মাঝে না বুঝে না জেনে প্রচারও করে থাকে।

কীভাবে আমাদের অধ্যয়ন শঙ্কামুক্ত হবে?

একজন মুসলিম পাঠকের উচিত পড়ার সময় শরীয়তের আলোকে পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের দক্ষতাকে কাজে লাগানো। অধ্যয়নকালে পরিপূর্ণ সচেতন থাকা।

সন্দেহপূর্ণ ও অপরিচিত বইয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। সুতরাং যা-ই পড়বেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর আকীদা এবং আপনার জানা শরীয়তের দলীল-প্রমাণ ও আপনার কাছে থাকা সহীহ-যঈফ হাদীসের আলোকে তা যাচাই করে দেখবেন। এভাবেই আপনার বইপাঠ হয়ে উঠবে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত।

সচেতনতার বিপরীত বিষয়সমূহ

১. লিখিত ও প্রকাশিত সব কিছুকে কোনরূপ যাচাই-বাছাই করা ছাড়াই নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া ও অন্ধভাবে এর অনুসরণ করা এবং এর প্রতি আস্থা প্রকাশ করে তা গ্রহণ করে নেওয়া।

২. সুদৃঢ়ভাবে জানা কোন বিষয় ও বাস্তবতা সম্পর্কে শুধু এই কারণে সন্দেহে নিপতিত হওয়া যে, ছাপা হওয়া বিষয়টি এর বিপরীত।

৩. অনেক বই ও লেখককে বড় করে উপস্থাপন করতে দেখে ধোঁকায় পড়া। বেদআতী ও মুনাফেক রচয়িতাদের নাম-উপাধির চমক দেখে তাকে বড় মনে করা। সেই সাথে কোন বই ও তার লেখকের বাস্তব মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হওয়া।

৪. অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিংবা কোন হিংসুটের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরামের গ্রন্থাবলী পাঠ করা থেকে বিরত থাকা।

৫. সেসব বিভ্রান্ত লেখকদের বিচ্যুতি সম্পর্কে অসতর্ক থাকা, যারা তাদের বই-পুস্তকের পাতায় ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রতিটি লাইনে নিজেদের বেদআত, ভ্রষ্টতা ও বিষবাষ্প ছড়িয়ে রাখে।

তাদের কিছু অপকৌশল

* ভ্রান্ত অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূল বক্তব্যে কাটছাঁট করা।
* নসসমূহকে (text) বিকৃত ও পরিবর্তন করা এবং তাতে বাড়ানো-কমানো।

* লক্ষ্যস্থল ব্যতিরেকে অন্য স্থানে নসকে উপস্থাপন করা।
* নসের এমন ব্যাখ্যা করা, যাকে শরঈ অর্থ সমর্থন করে না। নসের শরঈ উদ্দিষ্ট অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা।

* জাল ও বানায়োট হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করা এবং বক্তব্যকে এমন ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধিত করা, যিনি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।
* শরীআহ বিরুদ্ধ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা। যেমন : আকল-বুদ্ধির পরিপন্থী দাবী করে সহীহ নসকে ছুঁড়ে ফেলা কিংবা এই দাবী করা যে, নসের জাহেরী ও বাতেনী দুই ধরনের অর্থ রয়েছে।
* বক্তব্যকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বাতিলপন্থীদের কথা দলিল হিসেবে পেশ করা এবং সেগুলোকে ব্যাপকহারে সংকলিত করে উপস্থাপন করা।
* দুর্বল বক্তব্য ও বিরল মতামত পেশ করা।
* সংশয়-সন্দেহের বীজ বপন করা এবং এর সমাবেশ ঘটিয়ে তাকে সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। অতঃপর নিরবতা অবলম্বন করে কোন এক পক্ষ

নেওয়া থেকে বিরত থাকা। অথবা খুব দুর্বল ভঙ্গিমায় সেসব সংশয়-সন্দেহের প্রতিউত্তর প্রদান করা।

* শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অচল জিনিসকে গ্রহণযোগ্য করার হীন মানসে মিথ্যা কসম ও দৃঢ়তা প্রকাশক ভাষার ব্যবহার করা।
* দ্বীনের সাহায্য করার ভাব ধরে শরীয়তের উপর আক্রমণ করা।
* বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট মানুষদের প্রশংসা করা এবং উলামায়ে কেরাম ও সঠিক পথের অনুসারীদের সমালোচনা-নিন্দা করা।
* চটকদার শব্দাবলী ব্যবহার করা, যেমন- স্বাধীনতা, সংস্কার, আধুনিকায়ন, উন্নয়ন, প্রগতি ইত্যাদি।
* ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে পরোক্ষ পদ্ধতি গ্রহণ করে পাঠককে এমন ভাবে স্বাধীন করে দেওয়া যে, সে নিজে থেকেই সেই চিন্তাধারা খুঁজে নেয়। যেমন, লেখক ভূমিকা স্বরূপ কিছু ভ্রান্ত কথা উপস্থাপন করে এর অনির্বায ফলাফল বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করেন। যাতে করে পাঠক সেটা এমনিতেই গ্রহণ করে নেয়। অনেক সময় লেখক দোষমুক্তির অভিনয়ও করে থাকেন।

এই কারণেই প্রতিটি অনুচ্ছেদের গুপ্ত ও পরোক্ষ অর্থের ব্যাপারে সচেতন থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় কর্তব্য হল, লেখকের আকীদা-বিশ্বাস ও তার চিন্তাধারা-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আগে থেকেই জেনে নেওয়া। আর এটা নিজের দক্ষতা বা অন্যকে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হতে পারে।

বই পুস্তকের প্রতি অনীহা

পড়ার ক্ষেত্রে অনেক মানুষের সবচে বড় সমস্যা হল, বইয়ের প্রতি অনীহা ও বিতৃষ্ণাভাব। যা অনেক সময় বৈরিতার রূপ ধারণ করে। অনেক মানুষই বই খোলার পর দ্রুত বিরক্তি ও ক্লান্তিতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ করে থাকেন। বিশেষ করে কঠিন বিষয়ের বইগুলোর ক্ষেত্রে এমনটা বেশি হয়ে থাকে। সেজন্যই বর্তমানে আমরা খুবই হতাশাজনক চিত্র দেখতে পাচ্ছি। তা হল, অনেকেই ধর্মীয় বই-পুস্তককে উপেক্ষা করে অনর্থক ও ফালতু গল্পের বই, রঙ-বেরঙের সচিত্র ম্যাগাজিন, নাচ-গান ও খেলাধুলা বিষয়ক পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলে অনেক সময় আমাদের শত্রুরা দম্ভের স্বরে বলে থাকে, 'মুসলিমরা বইটই পড়ে না। পড়লেও বুঝে না। আর বুঝলেও সেটা গভীর থেকে অনুধাবন করে না।'

এমনিভাবে দুঃখজনক আরেকটা বাস্তবতা হল, অনেক গ্র্যাজুয়েট ছাত্র সার্টিফিকেট অর্জন করার পরে পড়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। অনেক শিক্ষক বছরের পর বছর তাদের জ্ঞানের ক্রমাগত হ্রাস পাওয়াকে সাদরে মেনে নেন। আবার অনেকে মাস্টার্সে উন্নীত হলে পড়া থেকে নিজেদের গুটিয়ে ফেলেন। অথচ তাদের জানাশোনার পরিমাণ বেড়েছে এবং জ্ঞানের পরিধি প্রশস্থ হয়েছে।

আরেকটি মনোকষ্টের বিষয় হল, বই সংগ্রহ করা থেকে বিমুখ হয়ে পড়া। এমনকি সাধারণ কিংবা জনকল্যাণমূলক পাঠাগার থেকে বই ধার করে আনার বিষয়েও অনাগ্রহী হওয়া। অনেক সময় দেখা যায়, পাঠাগার ওয়াকফ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিরর্থক হয়ে পড়ে। কারণ এই অনীহা আর অনাগ্রহের কারণে তা থেকে যথাযোগ্য উপকার লাভ করা হয় না। অনেক মানুষকে দেখবেন, তারা বই ক্রয় করে। কিন্তু পরে সেটা সংগ্রহশালার তাকে বন্দি করে রেখে দেয়। বইয়ের উপর ধুলোবালির আস্তর জমে উঠে। সেগুলো খুলে পড়ার মাধ্যমে যত্ন নেয় না। দেখা যায়, বইয়ের কিছু পৃষ্ঠা একটা অপরটার সাথে সেঁটে আছে। যা বইটি বহুদিন না খোলার নিরব সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে।

যে ব্যক্তি শুধু বই সংগ্রহ করে কিন্তু সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখে না, পড়ে না তার বিষয়ে জনৈক কবি বলেছেন–

إِذَا لَمْ تَكُنْ حَا فِظًا وَا عِيًا * فَجَمْعُكَ لِلْكُتُبِ لَا يَنْفَعُ
تَحْضُرُ بِالْجَهْلِ فِى مَجْلِسٍ * وَعِلْمُكَ فِى الْبَيْتِ مُسْتَوْدَعُ

বই কিনে না পড়ে রেখে দিবে যবে; সেই বই উপকারী হবে না তো তবে।

অজ্ঞতা সাথী হবে যেখানেই যাও; জ্ঞানসব বই-তাকে পড়ে শুধু রবে।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন মানুষ বইয়ের প্রতি আগ্রহী নয়; বিশেষ করে যেসব বই উপকারী তার প্রতি? কেন তারা বই পাঠে অনীহা পোষণ করে? কেন অনেক মানুষ আর বইয়ের মাঝে এক ধরনের বৈরিতা লক্ষ্য করা যায়? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আরো কয়েকটি বিষয়ে জানতে হবে আমাদেরকে।

মানুষ ও বইয়ের মাঝে বৈরিভাব তৈরি হওয়ার কারণসমূহ

১. দ্রুত বিরক্ত হওয়া। ধৈর্যের কমতি থাকা। কোথাও দীর্ঘ অবস্থানের মতো দৃঢ়তা ও অবিচলতা না থাকা। পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিরতার অভাব থাকা। এটা স্পষ্টভাবে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বুঝে আসে, যে খুবই অস্থিরচিত্তের অধিকারী। এদিক-সেদিক গমনাগমন করতেই বেশি ভালোবাসে। লম্বা সময় এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না।

২. বইপাঠ ও এর গুণাগুণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। আর মানুষ যে বিষয়ে অজ্ঞ হয় তা সে পছন্দ করে না।

৩. বই বা বিষয়বস্তুর দীর্ঘতা।

৪. প্রারম্ভেই ভুল পন্থা অবলম্বন করা। তা হল, কোন শাস্ত্রের প্রাথমিক ও সহজ
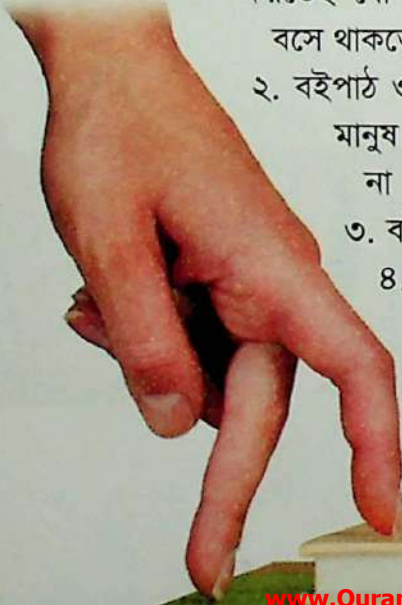
বইগুলো পাঠ না করেই বড় বই দিয়ে পাঠ শুরু করা। এটি পড়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

৫. বিষয়বস্তু নির্বাচন কিংবা ভাষাগত ক্ষেত্রে লেখকের উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি অবলম্বন করা। যেমন, আমাদের পূর্ববর্তী অনেক মহা মনীষী আলেমগণ এমনটি করতেন। অনেক সময় বই-পুস্তক এমন ভাষায় লেখা হয় যা লেখকের সমকালীন পাঠকদের উপযোগী। সেই সাথে তাতে ব্যবহার করা হয় এমন সাহিত্যপূর্ণ রচনাশৈলী, যা শরঈ ইলমী লেখনীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তো যখন পরবর্তী যুগে সমাজের মানুষের মধ্যে অবক্ষয়প্রাপ্ত ও নিম্নমানের কথ্য ভাষার প্রসার ঘটে এবং কুরআনের ভাষার মতো সাহিত্যপূর্ণ ভাষার ব্যবহার কমে আসে তখন সেই সমাজের একজন পাঠকের ওসব বই সহজে বুঝতে না পারাটাই স্বাভাবিক। ফলে তার ভেতর পড়ার প্রতি এক ধরনের অনীহা সৃষ্টি হয় এবং বইয়ের প্রতি নানা রকম অভিযোগ তৈরি হয়। অথচ প্রকৃত ইলম পূর্বকালে লেখা সেসব বই-পুস্তকের ভেতরই বিদ্যমান। বাস্তবিকপক্ষেই পূর্ববর্তীদের রচনাসমগ্র অল্প হলেও তাতে বরকত বেশি। কিন্তু পরবর্তীদের রচনাবলী বেশি হলেও তাতে বরকত কম।

৬. বইয়ের ব্যবহৃত পরিভাষার সাথে পরিচয় না থাকা। ফলে এটি বইপড়া ও তা বুঝার পথে অন্তরায় হয়ে থাকে।

৭. পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করার মতো বন্ধু-বান্ধব ও সাথী-সঙ্গী না থাকা।
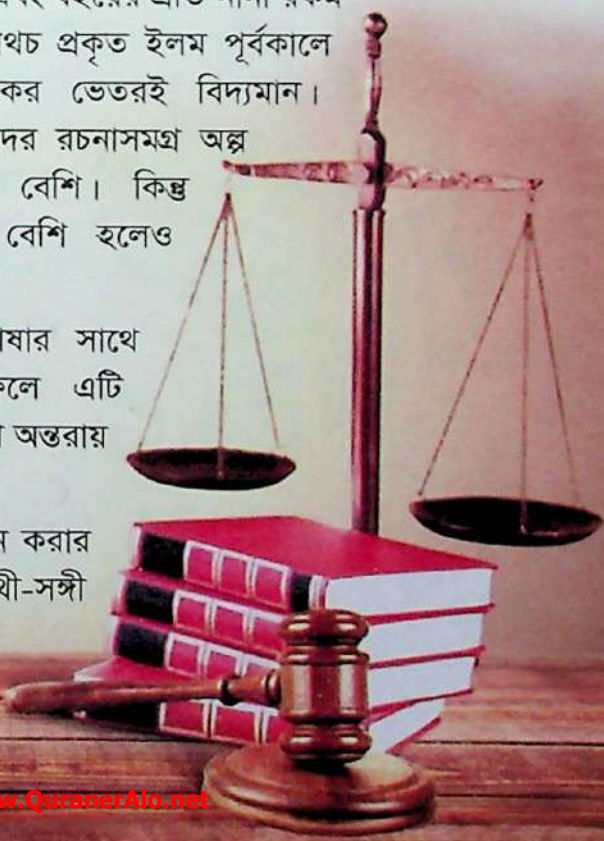
৮. ভালোকে মন্দের সাথে মিশিয়ে ফেলা এবং ক্ষতিকর অধ্যয়নে জড়িয়ে পড়া। যেমন, ফালতু পত্র-পত্রিকা, বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন ও অনুপযোগী বই-পত্র পড়া।

৯. সামাজিকভাবে ব্যপকহারে পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান না করা এবং ছাত্রদের পাঠ্যবই পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা। বরং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় যে, সেখানে জ্ঞানমূলক সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন করার পরিবর্তে কেবল নোটভিত্তিক পড়াশোনার মধ্যেই ক্ষ্যন্ত থাকা হয়। এরচেও আরো বেশি আফসোসের কথা হল, যখন অভিভাবক সন্তানের হাতে পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোন বই দেখেন তখন তাকে তা পড়া থেকে কঠিন ভাষায় বারণ করেন। এবং শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়ার মধ্যে সীমাদ্ধ থাকতে আদেশ করেন।

১০. বই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে পরামর্শ না করা। অথবা এমন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা যিনি এর অযোগ্য।

১১. ব্যাকরণে কাচা হওয়া এবং শব্দার্থ বুঝার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকা। ভাষাশৈলী ও অলংকারপূর্ণ সাহিত্যের কারণে লেখা বুঝতে না পারা।

১২.ভবঘুরে টাইপের হওয়া। অবিচলতা না থাকা। অনেক পাঠকই এই অভিযোগ করে থাকেন। তারা বলেন, আমরা এক পৃষ্ঠা পড়ার পর দেখা যায় কিছুই বুঝি নি, পুরোপুরি না বুঝেই বই শেষ করতে হয়। এই সমস্যা সমাধানের উপায়

নিয়ে সামনে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে।

১৩. দৃঢ় সংকল্প না থাকা এবং অল্প পড়াতেই তুষ্ট ও পরতিৃপ্ত হওয়া। যেমন কারো কারো পানাহার ও ঘুম ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না। কেমন যেন এর জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সে কেবল বইয়ের খোলসটাই কিনে আনে আর অধ্যয়নের নামই শুনে থাকে। এর থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হতে পারে না।

এই ধরনের মানুষ নিজেকে পড়ার ভেতর ব্যস্ত রাখতে পারে না। বইয়ের সামনে নিজেকে আটকে রাখতে সক্ষম হয় না। বরং এরা অলসতা আর ঘুমের ক্ষেত্রেই পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে পারে। অথচ বাস্তবতা হল তা-ই, যা ইমাম ইয়াহয়া ইবনে আবি কাসীর রাহ. বলেছেন–

لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ

শারীরিক আরামের মাধ্যমে কখনো ইলম অর্জন হয় না।

[জামিউ বায়ানিল ইলম : ১/১৮৩]

১৪. অনর্থক কাজে ব্যস্ত থাকা। যেমন, মুভি, সিরিয়াল এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর পরিবেশিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখা। খেলা-ধুলা ও বিভিন্ন টুর্নামেন্ট নিয়ে পড়ে থাকা। তাস খেলা। অনেকে তাদের দিনের বড় একটা সময় এসব অনর্থক কাজের পেছনে ব্যায় করেন। আর পড়ার জন্য খুবই কম সময় বরাদ্দ রাখেন। এরা আবার কথায় কথায় বলে থাকে, 'আমার সময় নেই'।

১৫. পড়াশোনার বাইরে অন্যান্য কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া। এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে,

প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং সব কাজের মাঝে সমতা রক্ষা করা হচ্ছে না। এমনিভাবে অনেকে অতিরিক্ত আয়-উপার্জনের উদ্দেশ্যে নিজেকে সদা-সর্বদা ব্যস্ততায় জড়িয়ে রাখেন।

১৬. অডিও শোনায় অভ্যস্ত হওয়া। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অডিওর প্রসার বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছে। অডিও শোনাকে পুরোপুরি পরিহার করার কথা এখানে বলা হচ্ছে না, বরং অডিও আর বই উভয়ের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কারণ অডিওর তুলনায় বইয়ের অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটা করা যেতে পারে যে, যখন পড়তে ভালো লাগে না তখন কেবল অডিও শোনা। যেমন ঘুমের মুহূর্তে। বিশ্রাম গ্রহণের বা জিনিসপত্র গোছগাছ করার সময়ে। গাড়ি চালানো বা ঘরের কাজ করার সময়ে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহ. এর দাদা আবুল বারাকাত রাহ. যখন গোসল করতেন তখন একজনকে আদেশ করতেন যাতে উঁচু আওয়াজে একটা বই থেকে পড়তে থাকে। তিনি এই সময়টাতেও বই থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করতেন। সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার বিষয়ে তারা এমনই সচেতন ছিলেন।

১৭. নির্ঘণ্টের প্রসার ঘটা। মুখস্থশক্তির দুর্বলতার এই যুগে এটি খুবই উপকারী। কিন্তু এইসব নির্ঘণ্টের অনেক ভালো দিক থাকা সত্ত্বেও এগুলো অনেক সময় তথ্য-উপাত্ত খোঁজাখুঁজি ও ঘাঁটাঘাঁটি করার চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে। এবং অনেক ছাত্রকে এমনসব উপকার থেকে বঞ্চিত করে যা নির্ঘণ্ট না থাকলে সে অর্জন করতে পারতো। এখানে নির্ঘণ্ট পরিত্যাগ করার প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি না। বরং বই পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং নির্ঘণ্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র।

১৮. বই-পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।

১৯. বইয়ের ছাপা ভালো না হওয়া। যেমন, অক্ষরগুলো ছোট কিংবা অস্পষ্ট হওয়া। প্রিন্টমিসটেক বা মুদ্রণ-বিভ্রাট থাকা, কাগজ নিম্নমানের হওয়া কিংবা প্রকাশনীর মান ভালো না হওয়া।

২০.সাধারণ পাঠাগার না থাকা। অথবা থাকলেও সেখানে যাওয়াটা কষ্টকর হওয়া এবং সেখান থেকে উপকৃত হওয়ার পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা থাকা।

২১. সার্টিফিকেট অর্জন কিংবা ভালোমানের কোন চাকরি-বাকরি পাওয়া ছাত্রদের পড়াশোনার উদ্দেশ্য হওয়া।

বই-পুস্তকের প্রতি পাঠকের অনীহা তৈরি হওয়ার কারণগুলোর উপর আলোকপাত করার পর এবার আমরা এসবের প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করবো।

পড়ার প্রতি অনীহার প্রতিকার

সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সর্ব প্রথম কাজ হল, আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। তার উপর ভরসা করা। দোআর মাধ্যমে তার আশ্রয় গ্রহণ করা। এর পাশাপাশি অন্যান্য উপায়গুলোও অবলম্বন করা। সেগুলো হলো–

১. ইলম ও জ্ঞানের মূল্য বোঝা। জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। পড়ার গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করা। এগুলো হল প্রতিকারের সবচে কার্যকরী মাধ্যম এবং ধর্মীয় বই-পুস্তকের মর্যাদা ও বারাকাত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার অন্যতম উপায়। এর জন্য যেসব মাধ্যম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম তা হল, জুমুআর বয়ান, বিভিন্ন দরস, সেমিনার, আলোচনা সভা, বই-পত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি।

   উৎসাহ প্রদান করতে বইপাঠের যেসব উপকারের কথা সাধারণত বলা হয়ে থাকে তার কিছু তুলে ধরা হল।

   * বই পাঠ করলে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন হয়। যার উপর আমল সঠিক হওয়া নির্ভরশীল। অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। এটি দূর না হবার কারণেই মূলত মানুষ নিন্দাবাদে জর্জরিত হওয়া, হারামে লিপ্ত হওয়া ও আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হওয়ায় আক্রান্ত হয়। সুতরাং জ্ঞান হল জীবন ও আলো আর অজ্ঞতা হলো মৃত্যু ও অন্ধকার।
   * আল্লাহর কালাম, নবীগণের কথা এবং উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

* সময়ের হেফাজত ও তা মূল্যবান কাজে ব্যয় হয়।

* একজন ব্যক্তি ও তার সময় বিনষ্টকারী বিপথগামী সাথী-সঙ্গীদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

২. পড়ার প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা। এর জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা হল–

ক. বইমেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা। পশ্চিমারা প্রচুর পরিমাণ এই জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ফলে তাদের সমাজে বই-সপ্তাহ, লেখক-সংঘ, পাঠক-সংঘ ইত্যাদি সাংস্কৃতির দেখা পাওয়া যায়। পাঠকদেরকে বইপাঠে আরো বেশি উৎসাহিত করে এমন যে কোন ধরনের চিন্তা ও পরিকল্পনার তাদের তুলনায় আমরাই বেশি হকদার। সুতরাং পাঠকদেরকে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য সব ধরনের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সহায়তা নেওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য।

খ. অধ্যয়ন সম্পর্কীয় সেমিনারের আয়োজন করা। বিভিন্ন স্কুল-মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান ধারার কার্যক্রম সংযোজন

করা। এবং পড়ার জন্য যথাসম্ভব আলাদাকরে বিশেষ কিছু সময় বরাদ্দ দেওয়া।

গ. বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান, প্রশংসা করা এবং বড় বড় অক্ষরে লেখা সহজ ভাষার রং-বেরঙের মজাদার শিশুতোষ গল্পের বই সংগ্রহ করে দেওয়ার মাধ্যমে ছোট বয়স থেকেই শিশুদের হৃদয়ে বই-পুস্তক ও পাঠের প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনে দেওয়া। ব্যয়-খাতের একটা অংশ তাদের বই কিনে দেওয়ার জন্য বরাদ্দ রাখা। পাশাপাশি তাদেরকে বইয়ের প্রতি যত্নবান হওয়ার ও বইয়ের হেফাজত করার উপদেশ দেওয়া। তবে শিশুদের ভেতর ভয়ের সঞ্চার করে কিংবা তাদের মনোজগতকে দূষিত করে এমন কিচ্ছা-কাহিনীর বই থেকে তাদেরকে দূরে রাখা বাঞ্চনীয়। বিশেষ করে তাদেরকে এমন সব বই-পুস্তক পড়তে দেওয়া উচিত যেগুলোতে সাহাবী, আলেম-উলামা ও বুযুর্গানেদ্বীনসহ এই উম্মতের মনীষী ও বীর-বাহাদুরদের জীবনালেখ্য আলোচিত হয়েছে। যাতে করে তাদেরকে অনুসরণ করার ভাবনা শিশুদের কচি মনের গহীনে গেঁথে যায়।

ঘ. ঘরের ভেতর সুন্দর ও গোছালো ব্যক্তিগত পাঠাগারের ব্যবস্থা করা।

ঙ. বই পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী নানা রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

চ. বিয়ে-শাদী, আকীকা, ঈদ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বই-পুস্তক উপহার দেওয়া।

ছ. বই প্রকাশের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া এবং যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা। লোভ ও একচেটিয়ে লাভের মনোভাব পরিত্যাগ করা। জনকল্যাণমূলক বিতরণ, উপহার প্রদান অথবা খরচ-মূল্যে বা অল্প লাভে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যেসব বই প্রকাশ করা হয় সেগুলোর মান ও সৌন্দর্য সঠিক রাখার চেষ্টা করা। এমনিভাবে দূরবর্তী শহরে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানকারী পাঠকদের হাতে ডাকযোগে বই পৌছে দেওয়ার সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভ্রাম্যমান পাঠাগারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা।

৩. বই পাঠের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলা যায় যে, বইপাঠ ফলপ্রসু কিংবা ব্যর্থ হওয়া এর উপরই নির্ভরশীল। সঠিকভাবে বইপড়া শুরু করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে নেওয়া ভাল হবে। তা হল–

মানুষের ভেতর মূল বিষয় হল অজ্ঞতা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের উদর হতে এমন অবস্থায় ভূমিষ্ট করেছেন যে, তোমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না।' [সূরা নাহল : ৭৮]

সকাল থেকে নিয়ে বিকেল- এই সময়কালের মাঝে সব কিছু শিখে ফেলা অসম্ভব। কোন ব্যক্তি চাইলেও একদিন একরাত সময়ের মধ্যেই সচেতন ও যত্নশীল পাঠক হয়ে উঠতে পারে না। এর জন্য

ধৈর্যসহকারে নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের দরকার হয়।

পড়ার ক্ষেত্রে একজন পাঠককে সাধারণত যেসব ধাপ পাড়ি দিতে হয় সেগুলোকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে–

১. প্রথমেই পড়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা।

এই বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হল প্রচণ্ড আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকা। যেমন অনেকের জীবনীতে ও বিভিন্ন ঘটনায় আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখে থাকি।

২. দ্বিতীয়ত একাগ্র অধ্যয়ন।

সাধারণত এর জন্য প্রচণ্ড ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার প্রয়োজন পড়ে। এই ধাপে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠক তেমন ফলাফল ও উপকার দেখতে পায় না। কারণ তিনি নতুন নতুন বিষয়ের সাথে প্রথমবারের মতো সবেমাত্র পরিচিত হচ্ছেন। পঠিত বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা ও উপলব্ধির জন্য তাকে আরো কিছু সময় ব্যয় করতে হবে। পাঠকের উচিত বিরক্ত না হয়ে ধৈর্যের সাথে অধ্যয়ন অব্যাহত রাখা। কারণ গন্তব্যে পৌছতে হলে তো অবশ্যই রাস্তায় দৃঢ়ভাবে থাকতে হয়

৩. তৃতীয়ত উপলব্ধিমূলক অধ্যয়ন।

এই ধাপে এসে পাঠক উচ্চস্তরে পৌছে যায়। ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলস্বরূপ পঠিত বিষয় তার ভালোভাবে বুঝে আসে। কঠিন সব খানা-খন্দক পাড়ি দিয়ে তিনি অধিকাংশ পড়াই বুঝতে সক্ষম হন। আগের জানা বিষয়ের সাথে নতুন করে জানা বিষয়ের সূত্রমূল খুঁজে পান। নিজের ভেতর জ্ঞানগত উন্নতি ও

প্রাচুর্যের উপস্থিতি স্পষ্টরূপে অনুভব করতে শুরু করেন।

৪. চতুর্থত পর্যালোচনামূলক অধ্যয়ন।

এই ধাপে এসে একজন মুসলিম পাঠকের সামনে ঐশী পথের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং তার জ্ঞানের পূর্ণতা আসে। শরঈ মাপকাঠির বিকাশ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত ও বিচার-বিশ্লেষণের সক্ষমতা তৈরি হয়। এর ভিত্তিতে সে লেখকদের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করা এবং তাদের বিচ্যুতি ও পদস্খলন বুঝতে পারার যোগ্যতা অর্জন করে। এভাবেই এক সময় হাতের কাছে পাওয়া সব ধরনের বই পড়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে।

৫. পঞ্চমত অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়ন।

এই ধাপে এসে একজন পাঠক ইলম ও জ্ঞানের মূলনীতিসমূহ আয়ত্ব করে অধ্যয়ন জগতের প্রশস্ত আঙ্গিনায় বিচরণ করে থাকেন। বড় বড় বই-পুস্তকের জটিল ও কঠিন জায়গাগুলো অনায়াসে পাড়ি দেন এবং অধ্যয়নের বিস্তৃত জগতে বিচরণ করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়।

পড়ার পদ্ধতি বিষয়ক এই লম্বা আলোচনার পর এবার আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

পড়া শুরু করার সঠিক পদ্ধতি

একজন মুসলিম পাঠকের কর্তব্য হচ্ছে, পড়ার শুরুটা সুন্দর ও সঠিকভাবে করা। এর জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে তা হল-

* কঠিন বইয়ের পরিবর্তে সহজ-সরল বই নির্বাচন করা।
* বড় ও বিশাল আকৃতির বইয়ের পূর্বে ছোট আকারের বই পড়া।
* যে কোন শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থাদী পড়ার পূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ের সহজ বই পড়া।

অনেকের ক্ষেত্রেই শুরুটা এলোমেলো হওয়ার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে তা হল–

১. তাড়াহুড়া করা। যা মূলত শয়তানের কাজ।
২. অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল উৎসাহ-উদ্দীপনায় আক্রান্ত হওয়া।
৩. নিজের ব্যাপারে অতিরিক্ত আস্থাশীলতায় ভোগা। অথচ কর্তব্য হল, সব বিষয়ে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখা।

শুরুতে ভুল করার কারণগুলোর অন্যতম হল, এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হওয়া।

ফলে সে সহপাঠীদের বলে বেড়ায়, লেখক বড় মাপের কেউ হোক বা ছোট মাপের, কিংবা সরলভাষী হোক বা কঠিনভাষী, তাতে আমার কোন ভাবনা নাই। আমি সবার লেখাই বুঝতে পারি। এই ধরনের মানসিকতা যারা লালন করে শীঘ্রই দেখা যায় যে তাদের মনোভাবের সাথে জ্ঞান-পাহাড়ের টক্কর লাগছে।

শক্তিশালী ইলমী রচনাশৈলী, সনদ তথা সূত্রপরম্পরা, রেওয়ায়েত বা বর্ণনা, ফুকাহায়ে কেরামের মতোবিরোধ ইত্যাদির সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে। তখন তার অন্তর্চক্ষু ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে পুনরায় পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে।

সে তখন বিরক্তি ও আড়ষ্টতায় আক্রান্ত হয়। এক পর্যায়ে মানসিক জড়তার কারণে বইপত্র রেখে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে। এর প্রতিকার খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। উদাহরণস্বরূপ, যেসব তাফসীর গ্রন্থে বিরল শব্দের অর্থ, আয়াতের অস্পষ্ট অর্থ ইত্যাদির আলোচনা রয়েছে। সেগুলো না পড়ে শুরুতেই প্রাচীন ও বড় বড় গ্রন্থের মাধ্যমে তাফসীর পড়া আরম্ভ করা। যার মধ্যে সনদসহ বিভিন্ন বর্ণনা, নানা রকম মতামত, কেরাআতের একাধিক ধরন, ভাষা ও ইবারতের মতপার্থক্য, আয়াত

থেকে উদ্ভাবিত বিভিন্ন শাখাগত মাসআলা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই ভুল পদ্ধতি পড়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

ইবনে কাসীরের মত বড় তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বে 'তাফসীরে আল্লামা ইবনে মাআদী' অথবা 'তাফসীরে শাওকানী' থেকে সংক্ষেপায়িত 'যুবদাতুত তাফসীর' প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থ নির্বাচন করা উচিত। এটাই হল উপযোগী ও যথাযথ পদক্ষেপ।

এমনিভাবে ফিকহের যেসব গ্রন্থে দলিলসহ প্রতিটি মাসআলাতে শুধু একটি মত উপস্থাপন করা হয়েছে সেসব গ্রন্থ পড়ার পূর্বেই এমন সব গ্রন্থ থেকে ফিকাহ পাঠ শুরু করা, যেগুলোতে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ, সবিস্তারে প্রত্যেক পক্ষের দলিল প্রমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি এমন একটি বিষয়, যা প্রাথমিক শিক্ষার্থী বা পাঠককে পড়ার প্রতি অনীহার পথে ঠেলে দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ফিকহের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করতে চায় তার জন্য ফিকহের বিস্তৃত গ্রন্থ

'উমদা' পড়তে চাওয়া মস্তবড় ভুল।

নবী চরিত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইবনে কাসীর রাহ. রচিত 'আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া' জাতীয় রেওয়ায়েত সম্বলিত বই-পুস্তক দিয়ে শুরু না করে এমন বই নির্বাচন করা যাতে কিছু শিক্ষা ও উপদেশের সাথে বর্ণনাগুলো অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আকীদা বিষয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে 'আকীদায়ে হামাদিয়া', 'শরহে তাহাবী' এবং 'সাফারিনীয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ দিয়ে শুরু না করে এমন বই দিয়ে শুরু করা যাতে আকীদা বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে মূলপাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন 'আকিদায়ে ওয়াসেতিয়া', 'আকীদায়ে তাহাবিয়'া, 'লুমআতুল ইতিকাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ।

এমনিভাবে সমাজ সংস্কারক দাঈ শায়খ আবদুল ওয়াহহাব রাহ. রচিত 'উসুলে সালাসাহ' 'কিতাবুত তাওহীদ' ইত্যাদি যেন অবশ্যই ইবনে তাইমিয়া রাহ. রচিত 'কিতাবুল ঈমান' বা 'আরিজুল কুলুব', কিতাবুত তাওহীদের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসম্বলিত গ্রন্থ 'তাইসীরুল আযীযীল হামীদ' ইত্যাদির আগে অধ্যয়ন করা হয়।

এমনিভাবে ইমাম নববী রহ. রচিত 'আরবাঈন' যেন হাদীস বিষয়ক অন্যান্য বিস্তারিত ব্যাখ্যাসম্বলিত গ্রন্থের আগে পড়া হয়। যেমন 'বুলুগুল মারাম' বা 'সহীহুল বুখারী' কিংবা 'মেশকাতুল মাসাবীহ' এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ।

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রেও পদ্ধতিগত বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। তা হল, মুস্তাহাব ও সুন্নত জাতীয় বিষয়গুলোর আগে ফরজ ও ওয়াজিব জাতীয় বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া। এমনিভাবে নফল ও উত্তম বিষয়গুলোর আগে ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া জাতীয় বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া।

এখানে আরেকটি বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন। তা হল, পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের গ্রন্থাদী পড়ার গুরুত্ব এবং তার মূল্য বোঝা। এই বিষয়ে বলা হয়ে থাকে, পূর্ববর্তীদের রচনা পরিমাণে কম হলেও তাতে বরকত বেশি। আর পরবর্তীদের রচনার পরিমাণ বেশি হলেও তাতে বরকত কম। এই কথা অবশ্য প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক লেখকের বেলায় খাটবে এমন নয়। তবে এটি যে পুরোপুরি অবাস্তব তা-ও নয়। কারণ, পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম ছিলেন কল্যাণময় যুগের মানুষ। জ্ঞান-গরিমা ও বোধ-বুদ্ধিতে তারা ছিলেন অনন্য। এর কারণ হল, তারা নববী যুগের অনেকটা কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী উলামায়ে কেরামের অবস্থা এর বিপরীত। এই জন্যই পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য কম হলেও তা বেশি ফলদায়ক। তাদের অল্প কথাতেই জ্ঞানের বিশাল বড় ধন-ভাণ্ডার লুকিয়ে থাকে। কেউ হয়ত বলতে পারেন, তাদের রচনা-পদ্ধতি তুলনামূলক কিছুটা কঠিন। এই কথাটা পর্যালোচনার দাবী রাখে।

মূলত সালাফে সালেহীন এবং রচনার ক্ষেত্রে যারা তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাদের বইপত্র কুরআন-হাদীসের সাথে খুব বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।
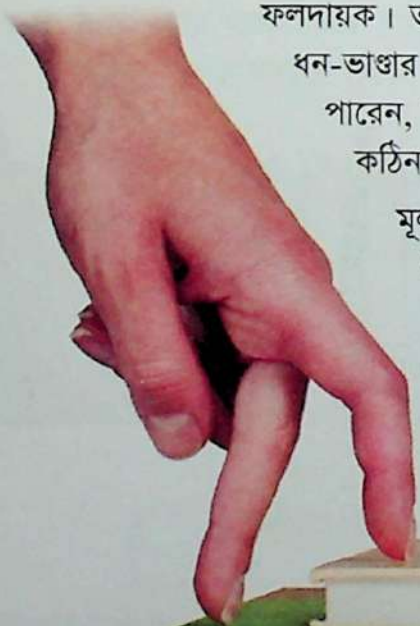
সেগুলো যদিও কিছুটা কঠিন ধাঁচের কিন্তু এর জন্য দায়ী হল আমাদের ভাষাগত দুর্বলতা ও বোঝার অক্ষমতা। তাই আমাদের নিজেদের যোগ্যতাকে আরো শানিত করা দরকার। যেসব বই-পুস্তক কষ্টকর ভাষা আর দুর্বোধ্য ভঙিতে লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই জ্ঞানগত দুর্বলতা কিংবা বিলাসিতার যুগে রচিত। সুতরাং সেগুলো পরে পড়া বা পুরোপুরি পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

যে বই যতো বেশি কুরআন-সুন্নাহ ঘনিষ্ঠ হয়, তার মাঝে ওহীর বক্তব্য দিয়ে দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয় ততো বেশি। ফলে তা সহজ হয়। লেখক যত বেশি কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি থাকেন তার রচিত বই-পুস্তক তত বেশি সহজবোধ হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করার মতো কেউ কি আছে?'। [সুরা কামার : ১৭]

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত না যে, পূর্ববর্তী আলেমদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি বিষয়। কারণ হল, এই গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে এমন যুগে যখন মুসলিমরা পূর্ণ শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিল। তাদের প্রভাব-শক্তিবল আর নেতৃত্ব ছিল। সে সময়ের লেখকেরা ইসলামের বিজয় ও প্রতিপত্তির ছায়াতলে বসে গ্রন্থ রচনা

করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের রচনাশৈলীতে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের উপাদান ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তী যুগে মুসলিমদের সর্বত্র পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার সময়কালে রচতি গ্রন্থগুলো এমন নয়। বরং উভয়ের রচনাশৈলীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মূলত পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলী অন্তরে দ্বীনের প্রতি আস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কারণ তারা শ্রেষ্ঠত্ব আর প্রতিপত্তির অবস্থান থেকে লিখতেন। সুতরাং পরাজয়ের মানসিকতায় আক্রান্ত পরবর্তী যুগের লেখকদের বই পুস্তক পড়ার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ তাদের লেখনীতে আপনি চিন্তাগত দুর্বলতা এবং হীনমন্যতার ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন। আপনার সামনে খুব সহজেই প্রতিভাত হবে যে, তাদের অনেকেই পশ্চিমা সভ্যতার নিষ্পেষণে এবং শত্রুর হাতে পরাজিত হবার কারণে ইসলামের অনেক নীতি-আদর্শ এবং শরীয়তের বহু বিধি-বিধান থেকেই সরে পড়েছেন।

আবার অনেক লেখক শরীয়তের কোন কোন হুকুমের ব্যাপারে এমন সব মারাত্মক অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন যা দ্বীনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পনের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। এরা জিহাদ-দাসপ্রথা প্রভৃতি মাসআলাতে বর্তমান যুগের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করার মানসে নিজেদের ধারণাপ্রসূত এমন সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করে থাকে, যার থেকে মনে হয় তারা আসলে

এগুলোকে অকার্যকর ও বাতিল করে দিতে চাচ্ছে। এসব কারণেই এই ধরনের প্রগতিশীল ও অতি আধুনিকতামনস্ক লেখকদের বই-পুস্তক পড়ার সময় চূড়ান্ত মাত্রার সতর্কতা ও পরিপূর্ণ সজাগদৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরি। যিনি পূর্ব যুগের লিখিত বই-পুস্তক পড়তে চান তার জন্য উচিত হল সহজভাষী ও সুবিন্যস্ত লেখনীর অধিকারী রচয়িতাদের বই নির্বাচন করা। যেমন আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহ.। তিনি তার রচিত গ্রন্থাবলীতে এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, এই বিষয়টি জরুরি হবার কারণ হল, যাতে করে পূর্ববর্তী আলেমদের গ্রন্থাবলীর প্রতি অন্তরে আকর্ষণ ও প্রসন্নতা তৈরি হয়। যেসব বই-পুস্তকের বিষয় ও ভাষা কঠিন এবং দুর্বোধ্য সেগুলো পড়ার পূর্বেই এটি করতে হবে।

অনেক পাঠক বলে থাকেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর মতো অনেক আলেমদের বই-পুস্তক আমরা পড়ে থাকি, কিন্তু সেগুলো ঠিক বুঝতে পারি না। অনেক কথাই অবোধগম্য থেকে যায়। বাস্তবেও এমনটা হয়ে থাকে। এর পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। যেমন অনেক লেখক আছেন যারা প্রচণ্ড গতিশীল হয়ে থাকেন। কলম হাতে তাদের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনাগুলো প্রবল বেগে উৎসারিত হতে থাকে। এমনই একজন হলেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.। কোন কোন মাসআলাতে বিস্ময়করভাবে তার জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে প্রচণ্ড গতিতে জ্ঞানের প্রস্রবণ ছুটতে থাকে। ফলে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর ঘটতে ঘটতে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যায়।

আলাদা অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়েও বিভক্ত হয়। অনেক পৃষ্ঠার পর গিয়ে আলোচনা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসে। এটি অনভিজ্ঞ পাঠকের ক্ষেত্রে তথ্যগত বিষয়গুলোর মাঝে সংযোগ খুঁজে পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পুরো আলোচনা বোঝার ক্ষেত্রে কিছুটা গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটি এমন একটি বিষয় যা সঠিকভাবে গ্রন্থ নির্বাচন ও ধারাবাহিক অনুশীলন এবং লেখকের রচনাশৈলীর সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেওয়ার মাধ্যমে আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে।

৪. অভিধান ও সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ব্যবহার করার মাধ্যমে কঠিন ও অপরিচিত শব্দগুলো আয়ত্ব করা। যেমন 'মুখতারুস সীহাহ' এর ছোট আকারের সহজে বহনযোগ্য সংস্করণও আছে। এতে প্রত্যেক শব্দের সাথে তার অর্থও বলে দেওয়া হয়েছে।

এরচে' আরেকটু বড় ধরনের হল 'আল মুজামুল ওয়াসীত'। যিনি হাদীসে নববীর অপরিচিত ও বিরল শব্দ সম্বলিত বই সংগ্রহ করতে চান তিনি 'আল নেহায়াহ ফি গরীবিল হাদীস' সংগ্রহ করতে পারেন। শুরুর দিকে হয়ত বুঝতে একটু বেগ পেতে হবে। পাঠকের কাছে কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে। তবে কিছু দিন

অনুশীলনের পর বিষয়টি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কারণ একবার বিরল কোন শব্দের অর্থ জানা হয়ে যাবার পর অধিকাংশ সময়ই নতুন করে আর সেই শব্দের অর্থ জানার প্রয়োজন পড়ে না। এভাবে ধীরে ধীরে চর্চার মাধ্যমে একজন পাঠকের ভাষাগত যোগ্যতা আরো পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে ।

৫. আরবি বই পড়ার ক্ষেত্রে আরবী ভাষার ব্যাকরণ জানা থাকা পঠিত বিষয় বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একজন পাঠকের জন্য আরবি ব্যাকরণের নানাবিধ দিক সম্পর্কে অবগত থাকা খুবই জরুরি। বিশেষকরে অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো এবং যেসব বিষয়ের অনুপস্থিতিতে অর্থের মধ্যে নানারকম বিকৃতি দেখা দিতে পারে তা জেনে নেওয়া কর্তব্য। অন্যথায় অনেক সময় এমন সব ভুলের জন্ম হয়, যার দ্বারা বিকৃতি ও অর্থ পরিবর্তনের মত ঘটনা ঘটে থাকে।

[টীকা : একবার কেউ একজন কিছু মানুষের সামনে একটি ফিকাহ গ্রন্থ পাঠ করছিল। সে মুহদিস (مُحْدِثٌ) শব্দকে, যার অর্থ হল ওজুবিহীন ব্যক্তি, সবার সামনে উচ্চারণ করলো মুহাদ্দিস (مُحَدِّثٌ), যার অর্থ হলো হাদীস বর্ণনাকারী। ফলে তার কথার অর্থ দাড়াল এরকম, মুহাদ্দিসের জন্য ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। উপস্থিত এক ব্যক্তি তাকে খোঁচা দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলো, যিনি মুফাসসির বা তাফসীর বিশারদ তার হুকুম কী হবে? সে উত্তরে বললো, তার জন্য তো সেটা আরো বেশি অবৈধ। এভাবেই না জেনে পড়ার কারণে এজাতীয় মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে।]

এর মাধ্যমে কথ্য ভাষার প্রতি আহবান এবং তা ব্যবহার করার প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর ভয়াবহতা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি কুরআন সুন্নাহর ব্যবহৃত বিশুদ্ধ আরবি ভাষা বুঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এই ব্যাপরটি আরো ভালোভাবে বুঝে আসে যখন আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে, হরকত [যবর-যের-পেশ-সাকিন-তানভীন]-যুক্ত এবং শব্দের শেষে এরাব [যবর-যের-পেশ-সাকিন-তানভীন] প্রদানকৃত বই-পুস্তক খুব কমই প্রকাশিত হয়ে থাকে। আর যেগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলোর ক্ষেত্রেও অনেক সময় দক্ষতা ও সুক্ষ্মতার সাথে নির্ভুল উপস্থাপনার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৬. শিক্ষককে বা যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ছাত্রকে বই পড়ে শোনানো। বিশেষ করে ইলমের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে রচিত বইপত্র। এতে যেসকল সুবিধা রয়েছে তা হল–

* ভুল উচ্চারণ থেকে রক্ষা পাওয়া।
* অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত না হওয়া।
* সমস্যাযুক্ত স্থানে জিজ্ঞেস করে নেওয়ার সুবিধা থাকা।

কবি বলেন-

مَنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْ شَيْخٍ مُشَافَهَةً * يَكُنْ عَنِ الزَّيْغِ وَ التَّصْحِيْفِ فِيْ حَرَمٍ

শায়েখ থেকে সরাসরি; শিখবেন ইলম যিনি, স্খলন এবং ভ্রান্তি থেকে; দূরে রবেন তিনি।

এই কবিতায় বিখ্যাত সেই উক্তির মর্মার্থ তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, 'ইলম ছিল মনীষীদের বক্ষস্থলে। পরে তা স্থানান্তরিত

হয়ে বইয়ের পাতায় চলে আসে। কিন্তু মূল চাবিকাঠি রয়ে গেছে সেই মনীষীদের হাতেই। [শাতেবী, আল মুআফাকাত : ১/১৪০]

অনেক সময় বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা ও অদ্ভুত মতাদর্শে অনেকেই আক্রান্ত হন। এটি মূলত উলামায়ে কেরামের কাছে পড়ার বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফল। তবে যদি আপনি এমন কোন জায়গায় থাকেন যেখানে যোগ্য শায়েখ বা উস্তাদ কিংবা ইলম অন্বেষণকারী কোন ছাত্রের দেখা পাওয়া মুশকিল তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কতর্ব্য হচ্ছে অন্যান্য দ্বীনি ভাইদের সাথে করে একসঙ্গে মাঝে মাঝে পড়তে বসা। কারণ একাকী পড়ার তুলনায় সংঘবদ্ধভাবে পড়লে ভুলের আশংকাটা অনেক কম থাকে।

৭. নিজের ভেতর এই জাতীয় কোন ভাবনাকে স্থান না দেওয়া যে, বই পড়তে আমার ভালো লাগে না। অথবা বই পড়া আমি পছন্দ করি না। বই খুলে বসলেই রাজ্যের সব ঘুম এসে আমার উপর হামলে পড়ে। মূলত এ জাতীয় নেতিবাচক ভাবনা একজন পাঠকের মনে স্বাভাবিক ভাবেই এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, সে বাস্তবেও এমনই। যা কিনা পড়ার প্রতি অনাগ্রহ দূর করার রাস্তাকে আরো

সংকীর্ণ ও কঠিন করে দেয়। তাই নিজের ব্যাপারে এমন ধারণা রাখা উচিত যে, এ সকল সমস্যা সহজেই কাটিয়ে উঠা সম্ভব। এগুলো স্থায়ী কোন বিষয় নয়। সামান্য চেষ্টাতেই এগুলো দূর হয়ে যাবে। নতুন করে পড়ার পথ উন্মোচিত হবে। মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এসকল কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব। এই পদ্ধতিকে যদিও অনেকে 'অনুপ্রেরণামূলক' বলে থাকেন কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এটি অত্যন্ত পরীক্ষিত ও ফলপ্রসু। সমস্যাগুলোর প্রতিকার সাধনে এটি অত্যন্ত কার্যকারী।

৮. চড়ামূল্যের কারণে কেনা সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে বই ধার নেওয়া। অথবা যৌথভাবে বই সংগ্রহ করা। মাঝে মধ্যে গণ-গ্রন্থাগার ও জনকল্যাণমূলক পাঠাগার পরিদর্শনে যাওয়া।

৯. দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ার প্রতি আগ্রহী হওয়া। কারণ সেগুলোতে মানুষের দৈহিক, আত্মিক ও বুদ্ধিগত বিষয়ের প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে। তাছাড়া দ্বীনী জ্ঞান এমন একটি দরকারী বিষয়, প্রত্যেক মুসলিমই প্রতিটি মুহূর্তে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকেন। যেমন, ইবাদাত-বন্দেগীর পদ্ধতি, লেনদেন-শিষ্টাচার ইত্যাদি। এর কারণ হল, একজন মুসলিম পাঠক যখন পঠিত বিষয়গুলো বাস্তবে অনুশীলন করবেন তখন তিনি অনেক উপকার দেখতে পাবেন। তার ভেতর আলাদা এক ধরনের অনুভূতি কাজ করবে।

এর বিপরীতে কিছু বই রয়েছে যেগুলো দর্শন নির্ভর ও জঞ্জালে ভরা। সেগুলোতে তেমন কোন জ্ঞানগত বিষয় ও বরকত থাকে না।

ফলে তা কেবলই বিরক্তি ও ক্লান্তি উৎপাদন করে। পাঠককে ধীরে ধীরে অধ্যয়ন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

১০. পঠিত বিষয়কে কার্যে পরিণত করা। মূলত পঠিত বিষয়ের ফায়দা লাভের অনুভূতি পাঠককে পড়ার প্রতি আরো উৎসাহিত করে। যেমন আপনি হজ্জ সম্পর্কে পড়ার পর হজ্জ করতে গেলেন। সেক্ষেত্রে পড়ার উপকারটা আপনি চাক্ষুষ উপলব্ধি করতে পারবেন। এমনিভাবে ওজু বা সালাত আদায় করার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি একটি বই পড়ার পর যখন প্রতিদিন এর বাস্তব অনুশীলন করবেন তখন এমনিতেই পড়ার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়ে যাবে। কেননা পড়ার ফলটা আপনার সামনে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অবস্থায় প্রতিভাত হচ্ছে। এমনিভাবে যদি আপনি এমন কোন মাসআলা বা সমস্যার সম্মুখীন হন যার বিধান ইতিপূর্বে আপনার পড়া আছে তখনও আপনি এক বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করবেন।

১১. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সুন্দর সুন্দর বাক্য নোট করে রাখা। এটিও পাঠককে পড়ার উপকার অনুধাবনে সহায়তা করে। এর কারণ হল, যখন পাঠক তার অন্তরে রেখাপাত করা বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, চমৎকার ঘটনা, দীর্ঘদিন যাবৎ তালাশ করতে থাকা কোন হুকুম ইত্যাদি নোট করতে থাকে তখন অল্প দিনের মধ্যেই তার কাছে মূল্যবান তথ্যের ভাণ্ডার গড়ে উঠে। এরপর সেগুলোকে সুন্দর করে খাতায় তুলে রাখলে যখনই সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি পড়বে তখনই সে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করবে এবং এসব মূল্যবান ও চমৎকার সংগ্রহ

থেকে উপকৃত হতে পারবে।

উলামায়ে কেরামের এমন অনেক গ্রন্থ রয়েছে যা মূলত তাদের পড়া ও গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে টুকে রাখা লেখা থেকে তৈরি। তারা সেগুলো সংকলিত করে বইয়ের রূপ দিয়েছেন। অনেকে আবার তাদের মনোজগতে জাগ্রত হওয়া ভাবনাগুলো লিপিবদ্ধ করে সংগ্রহ করেছেন।

ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মাঈন রাহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি হাদীস অন্বেষণ করবে তার কর্তব্য হল, মুহাদ্দিস ও কলম থেকে কখনও দূরে না সরা। কোন কিছু শোনার পর লিখতে অবজ্ঞা না করা। সুতরাং তোমরা লেখার মাধ্যমে ইলমকে আয়ত্তে রাখো। [আল-জামে লি আখলাকির রাবি ওয়াস সামে' : ২/১৮৪]

[টীকা : এই জাতীয় কিছু বই হল, ইবনুল কাইয়িম রাহ. এর 'বাদায়েউল ফাওয়াদে' ইবনুল জাওযী রাহ. এর 'সয়দুল খাওয়াতির' ইত্যাদি। অনেক আলেমরা তাদের হজ্জ এবং অন্যান্য সফরে অর্জিত হওয়া অভিজ্ঞতা নিয়েও গ্রন্থ রচনা করেছেন।]

এই বিষয়ে পাঠকদের উপদেশ দিয়ে কবি বলেন–

اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَ الْكِتَابَةُ قَيْدُهُ * قَيِّدْ صُيُوْدَكَ بِالْحِبَالِ الْمُوَثَّقَةِ

فَمِنَ الْحِمَاقَةِ أَنْ تَصِيْدَ غَزَالَةً * وَ تَتْرُكُهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَةً

ইলম হল শিকার তোমার; লেখা তাকে ধরা, দায়িত্ব তোমার এই শিকারকে; শক্ত পাকড়াও করা।

হরিণ শিকার করে যদি; ছাড়ো মুক্ত বনে, নির্বোধ এবং বোকা তোমায়; বলবে সকল জনে।

গুরুত্বপূর্ণ সারাংশ কথা ইত্যাদি মুখস্থ করে রাখা। সেই সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যদের সাথে সেসব নিয়ে

আলোচনা করা। যাতে করে তারাও এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এর দ্বারা মূলত নিজের মুখস্থ করা বিষয়টি আরো পাকাপোক্ত হয়ে থাকে।

১২. পড়ার মধ্যে বৈচিত্রতা আনয়নের চেষ্টা করা। এর জন্য আপনি পঠিত বই বা বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আছে, যখন কোন মজলিসে তার বিরক্তি চলে আসতো তখন তিনি বলতেন, 'কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আসো।'

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. রাত্রে খুবই কম ঘুমাতেন। নিজের কাছে বেশ কিছু খাতা রেখে দিতেন। যখন এক বিষয়ে বিরক্তি অনুভব করা শুরু করতেন তখন সেটা পরিবর্তন করে অন্য কোন বিষয় দেখা শুরু করতেন। তিনি নিজের সাথে পানিও রাখতেন। চোখে সেই পানির ঝাপটা দিয়ে নিজের ঘুম দূর করতেন।

[তালীমুল মুতাআল্লিম তরিকুত তাআল্লুম :১১৭]

মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের রচনার মতো বিস্তারিত ও প্রচুর মাসআলা সংবলিত গ্রন্থ পড়তে গেলে অনেক সময় রুক্ষতা সৃষ্টি হয়। তখন এর সাথে অন্য কোন সহজ বিষয় পড়ার দ্বারা কিছুটা প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনা উচিত।

১৩.অর্জিত জানাকে স্থায়ী করার জন্য পঠিত বিষয়কে পুনরায় পড়া। ইমাম বুখারী রাহ.কে তার মুখস্থশক্তির রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, মুখস্থ রাখার প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর বার বার পঠিত বিষয়ে দৃষ্টিপাত করার চেয়ে বেশি উপকারী কোন জিনিসের কথা আমার জানা নেই।

[হাদয়ুস সারী : ৪৮৮]

একাধিকবার পড়ার আরেকটা উপকার হল, এতে করে পাঠকের নতুন নতুন অর্থ জানা হয়। যা ইতিপূর্বে তার জানা ছিল না। বিশেষকরে কুরআনে কারীম নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে পাঠক কখনও পরিতৃপ্ত হন না। কারণ এর নতুনত্ব ও অভিনবত্ব কখনো শেষ হবার নয়। যতোবারই একজন পাঠক চিন্তা-ভাবনার সাথে বুঝে বুঝে কুরআন পাঠ করবে ততোই তার সামনে নতুন নতুন শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হতে থাকবে।

ইলমী বই-পুস্তক বারবার পড়ার দ্বারা ইতিপূর্বে মুখস্থ করা বিষয় আরো পকাপোক্ত হয়।

পাঠকের মুখস্থশক্তি নতুন করে আরো শানিত হয়। উপলব্ধির নিত্য-নতুন ক্ষেত্র ফুটে উঠে। কেউ একজন বলেছিলেন, যখন আমি নতুন কোন বই প্রথমবার পড়ি তখন মনে হতে থাকে যেন আমি একজন নতুন বন্ধু পেলাম। যখন দ্বিতীয় বার পড়ি তখন মনে হতে থাকে পুরাতন কোন বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হচ্ছে।

১৪. কোন বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। কেননা যেসব বিষয় পাঠককে পড়া থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তার মধ্যে অন্যতম হল পঠিত বিষয় ঠিকমত বুঝতে না পারা।

এই ক্ষেত্রে করণীয় বিষয় সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের জীবনীতে যা পাওয়া যায় তা হল–

যখন তাদের কাছে কোন মাসআলা কঠিন মনে হত, বুঝে আসতো না, অথবা যখন তারা কোন দুর্বোধ্য বিষয়ের সম্মুখীন হতেন তখন আল্লাহর স্মরণাপন্ন হতেন। তার কাছে অনুনয়-বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করতেন। তার দরবারে রোনাজারি করতেন। যাতে তিনি সব কিছু স্পষ্ট করে সকল অবোধগম্যতা দূর করে দেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. এমন কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলে আল্লাহ তাআলাকে ডেকে বলতেন–

'হে নবী ইবরাহীমকে ইলমদানকারী, আমাকে ইলম দান করো। হে সুলাইমানকে বুঝদানকারী, আমাকে বুঝ দান করো।

[ইলামুল মুআক্কিয়ীন : ৪/২৫৭]

এভাবে দোআ করার কারণ হল, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ

অর্থাৎ, 'আমি সুলাইমানক বুঝ দান করেছি।' [আম্বিয়া : ৭৯]

এই প্রার্থনাই যে কোন বইয়ের অবোধগম্য মাসআলা অথবা কোন শব্দ, কিংবা দুর্বোধ্য বাক্যের মর্মার্থ পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে দিতে সক্ষম।

১৫. জটিল ও সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হলে আলেমদের স্মরণাপন্ন হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা না জানো তবে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো।' [নাহল : ৪৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلَّا سَئَلُوْا، إِذْلَمْ يَعْلَمُوْا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

অর্থাৎ, 'না জানা থাকলে তারা কেন জিজ্ঞেস করে নেয় না? কারণ অজ্ঞতার ঔষুধ হল প্রশ্ন করা।'

[আবু দাউদ : ৩৩৬, আলবানী রাহ. একে সহীহ বলেছেন]

১৬. অনেক সময় বুঝে না আসা বিষয়টির পেছনে অতিরক্তি সময় ব্যয় না করা। বরং তা রেখে দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া। যাতে করে এর পেছনে দীর্ঘ সময় নষ্ট করা এবং বিরক্ত হওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। পরবর্তীতে এটি অন্য কোথাও পড়ে নিলে কিংবা কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অবশ্য সব সময় লেখককে নির্দোষ ঘোষণা করে শুধুমাত্র পাঠকের বুঝশক্তির দুর্বলতাকে দায়ী করা অনুচিত। কারণ অনেক ক্ষেত্রে লেখকই তার ভাবনাটা সুন্দর ও সহজভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন না। প্রকাশভঙ্গির অদক্ষতা আর ভাষাশৈলীর স্বল্পতার কারণে কাঙ্ক্ষিত বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে তিনি ব্যর্থ হন।

১৭. ইলমী বই-পুস্তকের ভূমিকা মনোযোগ সহকারে পড়া। কারণ, এতে অনেক সময় বইয়ে ব্যবহৃত লেখকের নিজস্ব পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. রচিত 'তাকরীবুত তাহযীব' গ্রন্থের পরিভাষাগুলো আগের থেকে না জেনে কেউ যদি পড়া শুরু করে তবে অনেক কিছুই তার বুঝে আসবে না। যেমন রাবীদের স্তর বর্ণনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা। এমনিভাবে রাবীদের অবস্থা বর্ণনা করা। কিন্তু পাঠক যদি বইটির শুরুতে লেখা লেখকের ভূমিকাটি পড়ে নেন তবে তিনি আর পেরেশান হবেন না। সব ধরনের দুর্বোধ্যতা কেটে গিয়ে বিষয়গুলো তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

ফিকহী মাযহাবের গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। কারণ, সেগুলোর কোনো কোনোটিতে লেখলের নিজস্ব পরিভাষা থাকে। যা আগে থেকে না জানলে অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব।

অনেক সময় সেসব পরিভাষা একটি অক্ষরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন–

((ق)) ((خ)) ((م)) ((د))

আবার অনেক সময় সংখার মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন–

(٤)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

অর্থাৎ, পাঁচজনে বর্ণনা করেছেন।

رَوَاهُ السِّتَّةُ

অর্থাৎ, ছয়জনে বর্ণনা করেছেন।

অনেক সময় একটা শব্দের কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন– ثَنَا অথবা نَا [যা মূলত حَدَّثَنَا ও أَخْبَرَنَا এর সংক্ষিপ্ত রূপ। –অনুবাদক]

অনেক সময় হাদীসের শেষে غَرِيْبٌ শব্দটি লেখা থাকে। অথবা ফিকহের গ্রন্থসমূহে লেখা থাকে اِتَّفَقُوْا অর্থাৎ সকলে একমত পোষণ করেছেন ইত্যাদি।

প্রত্যেক মাযহাবের আবার নিজস্ব পরিভাষা আছে। অনেক সময় পরিভাষাটা একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। যেমন ইমাম তিরমিজি বলে থাকেন, حَسَنٌ صَحِيْحٌ অথবা حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ। অনেক ফকীহগণ তাদের গ্রন্থে বলে থাকেন–
((قاله الشارع)) ((خلا فا لهما)) ((خلا فا له)) ((قا له القاضى)) ((قاله الشيخ))
ইত্যাদি।

অনেক সময় কোন কোন আলেমের নির্দিষ্ট বিষয়ে চুপ করে থাকার সুনির্দিষ্ট একটি অর্থ থাকে। যেমন, ইমাম আবু দাউদ রাহ. তার সুনানে আবু দাউদে হাদীস উল্লেখ করার পর চুপ করে থাকলে ওই হাদীস তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে অনুমিত হয়।

ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. তার রচিত ‘তালখীসুল হাবীব’ গ্রন্থে নিরবতা অবলম্বন করা, ইবনে আবি হাতেম রাহ. তার ‘কিতাবুল জারহি ওয়াত তাদীল’ গ্রন্থে কোন কোন রাবীর বিষয়ে চুপ থাকা ইত্যাদি।
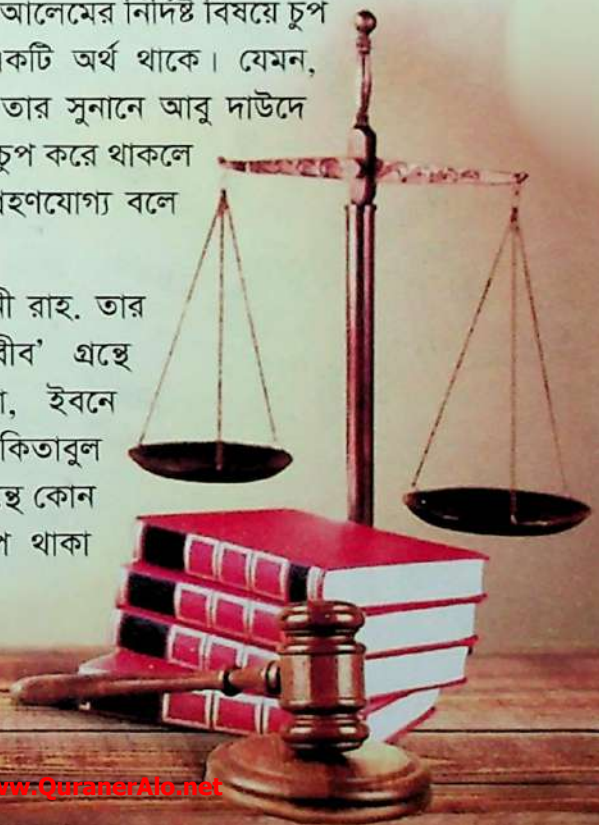
অনেক আলেমগণ তাদের গ্রন্থের ভূমিকাতেই নিজের বিশেষ পরিভাষার ব্যাখ্যা দিলেও অন্য অনেকে সেই কাজটি করেন গ্রন্থের ভেতরে বা একেবারে শেষে। আবার অনেকে নিজেদের পরিভাষা বিষয়ে কিছুই বলেন না। সেগুলো মনোযোগের সাথে খোঁজাখুঁজি ও তালাশ না করলে বুঝতে পারা মুশকিল। বর্তমানে এমন অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়, যেগুলোতে অন্য অনেক গ্রন্থের লেখকদের পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

১৮. ভুল, বিকৃতি ও মুদ্রণ-বিভ্রাটের বিষয়ে সতর্ক থাকা। এগুলো বোঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং অর্থকে পরিবর্তন করে ফেলে। এগুলো মূলত লিপিকারের বিকৃতি অথবা প্রকাশকের ভুল কিংবা পাঠকের অসর্তকতার কারণে ঘটে থাকে।
নিম্নে এমন কিছু তাসহীফ ও তাহরীফের উদাহরণ পেশ করা হল, যেগুলো নিয়ে উলামায়ে কেরাম স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।

[টীকা : তাসহীফ হল, এমন দুইটা শব্দের একটা অপরটা সাথে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, যেগুলো লেখার ক্ষেত্রে একই রকম হলেও 'নুকতা'র ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পাথর্ক্য থাকে। যেমন–

غدر কে عذر লেখা। عيب কে غيب লেখা। আর তাহরীফ হল নুকতা ও বানান উভয়টাই একই রকম কিন্তু শুধু হরকতে পার্থক্য এমন দুই শব্দের একটাকে অন্যটার মাধ্যমে পরিবর্তন করা। যেমন خَلق ও خُلق, قَدم ও قِدم ইত্যাদি।)

প্রথম উদাহণ : এক ব্যক্তি লাইস ইবনে সাআদ রাহ. এর কাছে এসে বলল–

كَيْفَ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِيْ نُشِرَتْ فِي اَبِيْهِ الْقِصَّةُ ؟

অর্থাৎ, 'নাফে রাহ. আপনার কাছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিভাবে কি বর্ণনা করেছেন, যার বাবার ব্যাপারে ঘটনা প্রচারিত হয়েছে?'

তখন লাইস রাহ. বললেন–

وَيْحَكَ ، إِنَّمَا هُوَ : فِي الَّذِيْ يَشْرَبُ فِي اَنِيَةِ الْفِضَّةِ يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ, 'ধুর! এটা তো ঐ ব্যক্তির বিষয়ে, যে রূপর পাত্রে পানি পান করবে তার পেটে জাহান্নামের আগুন টগবগ করবে।'

[আল জামে লি আখলাকির রাবী ওয়াস সামি' : ১/২৯৪]

এখানে ঐ ব্যক্তি يشرب কে نشرت , ابيه কে انية আর الفضة কে قصة তে পরিবর্তন করেছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : আবুল ইনা বলেন, আমি কোন এক গাফেল মুহাদ্দিসের মজলিসে উপস্থিত হলাম। তিনি একটি হাদীসে কুদসী উল্লেখ করলেন, যার সনদ ছিল এমন– 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবরাঈল থেকে তিনি আল্লাহ তায়ালা থেকে তিনি এক ব্যক্তি থেকে।' তখন আমি তাকে বললাম, 'এই লোকটি কে যে আল্লাহ তাআলার শায়েখ হওয়ার যোগ্যতা রাখে?।' তখন সবাই ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে যে, সেই মুহাদ্দিসের উচ্চারণ বিকৃতি ঘটেছে। মূলত শব্দটা ছিল عَزَّوَجَلَّ।

[প্রাগুক্ত ১/২৯৮৪]
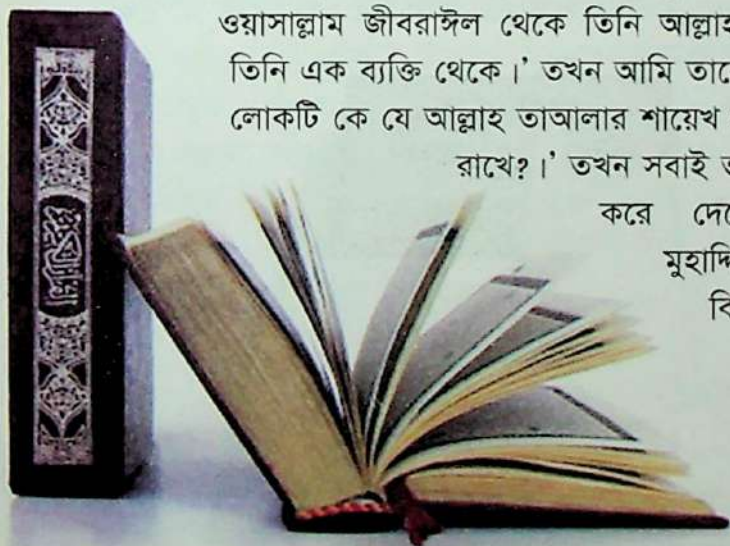
তো ঐ মুহাদ্দিস عز কে عن আর وجل এর واو কে ر দ্বারা পরিবর্তন করে رجل [ব্যক্তি] বানিয়ে দিয়েছে।

আগের যুগে হরফের মধ্যে নুকতা না দেওয়া এবং হরফের মাধ্যমে শব্দের উচ্চারণ স্পষ্ট না করে দেওয়ার কারণে অনেক সময় এই ধরণের ভুল সংগঠিত হত।

কিন্তু হরফের নুকতা আর হারাকাতের মাধ্যমে উচ্চারণ নির্দেশনা স্পষ্ট করে দিলে এই জাতীয় ভুল খুব কমই ঘটতো।

কিছু সনদ ও মতনে এ জাতীয় ভুল হওয়ার উদাহরণ شعبة কে عَنَزَة কে عَنْزَة , خرير কে جرير , جزرة কে خرزة , خبز কে خبر , سبعة পড়া।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম عَنَزَة বা বর্শাকে সুতরা বানিয়েছিলেন। কোন এক সালাতে। তো মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল আনায়ি রা. বলতেন, আমরা সেই গোষ্ঠী, যাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ, আমরা আনাযাহ (عَنَزَة) অঞ্চলের মানুষ। [প্রাগুক্ত ১/২৯৫] অথচ হাদীসে عَنَزَة শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল বল্লম বা ছোট বর্শা। সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতেন।

[টীকা : আল-আনাযী শব্দটা আরবী عَنَزَة এর দিকে সম্বন্ধিত। যা রবীআ গোত্রের একটি প্রশাখা। দেখুন আল-আনসাব ৪/২২১-অনুবাদক]

অনেক মানুষ কুরআন পাঠের ক্ষেত্রেও উচ্চারণ বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে। فان لم يصبها وابل فطل এর মধ্যে فطل এর জায়গায় فظل পড়ে। اخيارکم কে ونبلو اخبارکم , يغرسون কে يعرشون , جبار কে خَتَّار, صيغة الله কে صبغة الله পড়ে থাকে।

লক্ষ্য করে দেখুন, যখন কেউ সুরা ফাতেহার মধ্যে اياكَ এর স্থলে اياكِ পড়বে কিংবা انعمتَ এর স্থলে انعمتُ পড়বে তখন অর্থটা কতো বেশি পাল্টে যায়।

এমনিভাবে সুরা বাকারার মধ্যে وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيطِيْنُ এর স্থলে وَاتَّبِعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ পড়ে তাহলে অবস্থাটা কী হবে!

এই ধরনের বিকৃতির অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

মোটকথা হল, আমাদের সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে যেসব বই-পুস্তক হরকতযুক্ত নয় এবং যেগুলি তাহকীকও করা হয় নি। উদ্ধৃতি প্রদান করার হয়নি এমন বই-পুস্তকের ক্ষেত্রে সতর্কতার মাত্রা যেন আরো বেশি থাকে।

১৯. অজ্ঞতা ও বাক্যের উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যর্থ হবার দরুন যেসব অদ্ভুত ও বিরল ধরনের অর্থের প্রতি সাধারণভাবে মস্তিষ্ক ধাবিত হয় সেগুলো সংশোধন করা। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। এমন কিছু হলে সাথে সাথে সঠিক বিষয় অনুসন্ধান করা এবং জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে নেওয়া কর্তব্য।

বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল।

প্রথম উদাহরণ : নিম্নোক্ত হাদীসটি পড়ার পর একজন সাধারণ মানুষ কী অর্থ গ্রহণ করবে?

لَا يَحِلُّ لِإِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَّسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন ব্যক্তির জন্য অন্যের ফসলক্ষেত্রে তার পানি সিঞ্চন করা বৈধ নয়।

[আবু দাউদ- ২১৬০, আহমদ -১৬৯৯০ শাইখ আলবানী রাহ. একে হাসান বলেছেন।]

সাধারণভাবে এই হাদীস থেকে যা বুঝে আসে তা হল, কৃষক ও চাষীর কতর্ব্য হল, নিজের জমি থেকে যাতে অন্যের জমিতে পানি না যায় সে ব্যবস্থা নেওয়া। অথচ এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। কারণ শরীয়তের নীতি হল, ভালো কাজে উৎসাহিত করা, পড়শীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। সুতরাং শরীয়ত কখনো এই ধরনের আদেশ দিতে পারে না। উলামায়ে কেরামের লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলি খুললে দেখা যাবে, এই হাদীসের ব্যাখ্যা হল-

এমন কোন মহিলার সাথে যাতে সহবাস করা না হয়, যার পেটে অন্যের কারো বাচ্চা রয়েছে এবং বাদী ক্রয় করার পর তার মালিকের কতর্ব্য হল, সহবাসের পূর্বে ঋতুস্রাবের মাধ্যমে তার গর্ভ পবিত্র করে নেওয়ার সুযোগ প্রদান করা। বংশধারাকে সংমিশ্রণ থেকে রক্ষা করার জন্য এটি অপরিহার্য।

দ্বিতীয় উদাহারণ : হাদীসে পাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ওড়না ছাড়া ঋতুস্রাবে আক্রান্ত নারীর সালাত কবুল করেন না।

[আবু দাউদ ৬৪১, ইবনে মাজাহ -৬৫৫, শাইখ আলবানী রাহ. একে সহীহ বলেছেন।]

এই হাদীসটি পড়ার পর প্রাথমিকভাবে একজন সাধারণ পাঠক কী মনে করবে? কিন্তু যে যাই মনে করুক, আসল কথা হল, আল্লাহ তাআলা ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় কোন মহিলার সালাত কবুল করেন না। চাই তা ওড়নাসহ হোক বা ওড়না ছাড়া। বাহ্যিকভাবে এই হাদীস থেকে যে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে তা সহজেই দূর হয়ে যাবে।

যদি আমরা উলামায়ে কেরামের লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থের দারস্থ হই। তখন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে যে, এখানে حَائِضٍ শব্দটি দ্বারা ঋতুবতী নারী বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন নারীকে বোঝানো যে ঋতুস্রাবের বয়সে উপনীত

হয়েছে, 'মুকাল্লাফ' বা শরীয়তের বিধান বহন করার যোগ্য হয়েছে। এমনিভাবে বিভিন্ন ফিকহের গ্রন্থে اَلْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ (অর্থাৎ নিহতের ক্ষতিপূরণ সমগোত্রীয়দের উপর) বাক্যটি দেখার পর অনেক ছাত্রই পেরেশানীতে আক্রান্ত হয়। এর কারণ হল, এই বাক্যে اَلْعَقْلُ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটা চেষ্টা করা সত্ত্বেও বুঝতে না পারা। এই শব্দটির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- কেউ নিহত হলে তার রক্তপণ আদায় করা। শব্দটির অর্থ সেই 'বোধ' নয়, যা মানুষ অনুধাবন করে বুঝে থাকে।

তৃতীয় উদাহরণ : اَلْإِسْلَامُ শব্দটি ইসলাম ধর্ম বুঝানো ছাড়াও অন্য আরেকটা অর্থ প্রকাশ করে। তা হল, নির্দিষ্ট এক ধরনের বিক্রি। একে 'বায় সালাম' বলে। এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে। বিষয়টি আগে থেকে জানা থাকলে কোন পাঠক যখন ফিকহের গ্রন্থে পড়বে। يَجُوْزُ الْإِسْلَامُ فِي كَذَا অর্থাৎ 'এমন ক্ষেত্রে ইসলাম জায়েয' তখন সে দিশেহারা হয়ে পড়বে না।

২০. অমনোযোগিতার প্রাবল্য এবং স্থিরতার অভাব। এটি পড়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এটি পাঠকের মনে এই অনুভব জাগ্রত করে যে, তার পক্ষে ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। বিষয়টি আপনি নিজের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে থাকবেন। অনেক সময় এমন হয় যে, আপনি পড়তে পড়তে পুরো একটা পৃষ্ঠা শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু কোন কিছুই বুঝতে পারেন নি। এর কারণ হল, আপনার চোখ যন্ত্রের মতো তার নিজের কাজ করে গেছে। কিন্তু আপনার

হৃদয় ছিল অন্যমনস্ক ও উদাসীন।

এই সমস্যাটার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত কথা উপস্থাপন করছি।

সাধারণত আমরা দুই ধরনের উদাসীনতা দেখতে পাই।

এক. চিন্তা-ভাবনার উদাসীনতা।

এটি তখন দেখা দেয় যখন চোখ শুধু পড়ে যায়, কিন্তু অন্তর অন্য কিছুর চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। শরীর থাকে এক জায়গায় আর অন্তর ও ভাবনা থাকে ভিন্ন জায়গায়। মূলত যখন দৃষ্টি অন্য কোন ব্যক্তি, বস্তু বা দৃশ্যের দিকে নিবদ্ধ থাকে তখন চোখের উদাসীনতা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় অন্তর চোখের অনুসরণ করলেও চোখ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে মনোযোগ স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

আবার অন্তরের অমনোযোগ পঠিত বিষয় বোঝা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পাঠকের উচিত দুই ধরনের অমনোযোগিতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, যাতে করে তার পক্ষে পঠিত বিষয় থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়। চোখ দিয়ে যে শব্দ-অক্ষর দেখবে অন্তর দিয়ে তার অর্থ অনুধাবন করবে। অমনোযোগিতা অত্যন্ত ব্যাপক একটি বিষয়। প্রায় সব মানুষই এতে কম-বেশ আক্রান্ত হয়ে থাকে। কারো অমনোযোগিতা অনেক দীর্ঘ হয় আর কারোটা খাটো। পড়ার সময় কারো মনে পুরো ভাবনার জোয়ার নেমে আসে। জোর প্রচেষ্টা চালানো ব্যতীত এগুলোকে দূর করার ভিন্ন আর কোন বিকল্প নেই।

অমনোযোগিতা দূর করার উপায়

অমনোযোগিতা দূর করার অনেকগুলো উপায় রয়েছে।

১. পড়ার সাথে সম্মতি জানানো। এটি মনোযোগ স্থাপনের অনেক বড় একটি মাধ্যম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে সালাত আদায় করার সময় তিনি খুব ধীরে-সুস্থে তেলাওয়াত করতেন। যখন এমন কোন আয়াত আসতো, যেখানে আল্লাহর গুণকীর্তনের কথা আছে তিনি সেখানে তাঁর গুণকীর্তন করতেন, তাসবীহ পড়তেন। আবার যদি এমন কোন আয়াত আসতো, যেখানে কোন কিছু প্রার্থনা করার প্রসঙ্গ আছে, তখন তিনি তা প্রার্থনা করতেন। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়ার প্রসঙ্গ এলে তিনি আশ্রয় চাইতেন।

[সহীহ মুসলিম : ৭৭২]

একবার তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন–

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

অর্থাৎ, 'তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?'

[সূরা কেয়ামাহ : ৪০]

তখন বললেন, সমস্ত পবিত্রতা আপনার জন্য, অবশ্যই আপনি সক্ষম।

[সুনানে আবি দাউদ : ৮৮৪, শাইখ আলবানি রাহ. একে সহীহ বলেছেন।]

এমনিভাবে সেজদার কোন আয়াত সামনে এলে তিনি সেজদা করতেন। এসব হল পঠিত বিষয়ের সাথে সম্মতি জানানো। আর এটা তো জানা কথাই যে, পঠিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া

ছাড়া সম্মতি প্রদান করা সম্ভব নয়।

অনেক পাঠকের মধ্যে পঠিত বিষয়ে সম্মতি জানানোর আলামত দেখতে পাওয়া যায়। আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, পড়ার সময় তিনি ভ্রুকুঞ্চন করছেন, অথবা মুচকি হাসছেন কিংবা প্রফুল্লিত হচ্ছেন। আবার অনেক সময় দেখবেন, তিনি বিস্মিত হচ্ছেন কিংবা হতচকিত হচ্ছেন। অথবা হো হো করে হেসে উঠছেন। কারণ, হয়ত তিনি হাস্যকর কিছু পড়ছিলেন তখন। গভীর মনোযোগের সাথে পড়ার ফলে সেটা বুঝতে পেরে হেসে ফেলেছেন।

প্রথম দিকে হয়ত খুব সহজে মনোযোগটা আসবে না। এর জন্য ধারাবাহিক অনুশীলন ও ধৈর্য্যধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

যখন বারবার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে পাঠক তার পূর্ণ মনোযোগ পঠিত বিষয়ের উপর নিবদ্ধ করতে পারবে তখন এদিক- সেদিকের চিন্তাগুলো স্বল্প সময়ের মধ্যেই দূর হয়ে যেতে বাধ্য হবে।

ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে এক সময় পড়ার প্রতি মনোযোগ প্রদান করা স্বাভাবিক ও আয়ত্তাধীন বিষয়ে পরিণত হবে। মূল কথা হল, এখানে লাগাতার প্রচেষ্টা ও ধৈর্য্যধারণটাই হল আসল বিষয়।

২. উঁচু আওয়াজে পড়া।

সাধারণত পাঠক তিন ধরনের হয়ে থাকে।

ক. উঁচু আওয়াজে পাঠকারী

খ. কোনরূপ শব্দ করা ছাড়াই শুধু দুই ঠোঁট নাড়িয়ে পাঠকারী।

গ. এমন পাঠক যিনি আওয়াজও উঁচু করেন না আবার ঠোঁটও নাড়ান না। তবে গভীর দৃষ্টিতে মনোযোগের সাথে পড়ে থাকেন।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন, তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক হচ্ছে সর্বোত্তম। কারণ তিনি গভীর মনোযোগের অধিকারী। ফলে তাকে আলাদা করে তেমন সতর্ক করার প্রয়োজন পড়ে না। তবে বাস্তব কথা হল, এই বিষয়ে একেক মানুষ একেক রকম। প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে যা গ্রহণ করে সে স্বচ্ছন্দবোধ করে থাকে।

পড়ার সময় যারা অমনোযোগিতায় ভোগেন তারা উঁচু আওয়াজে পড়ে

দেখতে পারেন। কারণ এর আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তা হল–

* এটি অন্তরে বেশি বদ্ধমূল হয়। কোন একজন আলেম বলেছেন, শিক্ষার্থীর উচিত পড়ার সময় আওয়াজ এই পরিমাণ উঁচু করা, যাতে করে সে নিজের পড়া নিজে শুনতে পায়। কারণ কর্ণ যা শ্রবণ করে অন্তরে তা গভীরভাবে গেঁথে যায়। সেজন্যই মানুষ পঠিত বিষয়টি শ্রবণ করার দ্বারা বেশি আত্মস্থ করতে পারে। [আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম : ৭২]
* এই পদ্ধতি বেশি বিশুদ্ধ। যখন পঠিত বিষয়টি বিশুদ্ধ ও সাহিত্যপূর্ণ হবে তখন তা পাঠকের ভেতরও বিশুদ্ধতা ও সাহিত্যরুচি তৈরি করে দিবে। এর জন্য, ভালো মানের কবিতা পড়া এবং সাহিত্যের নির্বাচিত অংশ পাঠ করা যেতে পারে। এটি বিশুদ্ধ ও সুন্দর বাচনভঙ্গিতে এবং অলংকারপূর্ণ ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা তৈরিতেও সাহায্য করে।

একজন আলেম কোন এক শায়েখ থেকে বর্ণনা করেন যে,

Contents

আমি সুন্দর ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে এক গ্রাম্য ছেলেকে কথা বলতে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সমগোত্রীয়রা তো অশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে। কিন্তু তুমি তাদের বিপরীত। এই শুদ্ধতা অর্জনের পেছনে রহস্য কী? সে উত্তরে বললো, আমি প্রতিদিন বিখ্যাত সাহিত্যিক জাহেযের বই থেকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মতো উচ্চ আওয়াজে পড়তাম। এভাবে অল্প ক'দিন যেতে না যেতেই আমার ভেতরে এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। [প্রাগুক্ত : ৩৭]

[টীকা: এই বিষয়টি বর্তমান যুগের ফাসেক লোকদের অজানা নয়। তাই তো একজন গায়ক, যে সঙ্গীত চর্চার প্রশিক্ষণ দেয়, যুবকদেরকে উদ্দেশ করে বলেছিল, আমি তোমাদেরকে 'তাজবীদ' শেখার পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা এটি তোমাদেরকে চমৎকার সুরে গান গাইতে সহায়তা করবে। কারণ হল, তাজবীদ শিক্ষা শব্দকে সহজ ও সুন্দরভাবে উচ্চারণে সাহায্য করে।]

* এই পদ্ধতি ঘুম দূর করে থাকে। আবু হামেদ রাহ. তার ছাত্রদের বলতেন, যখন তোমরা পড়বে তখন উঁচু আওয়াজে

পড়বে। কেননা এটি পড়া আত্মস্থ করতে সহায়তাকারী এবং ঘুম বিতাড়নকারী। (আল হাসসু আলা তলাবিল ইলম : ৩৭)

৩. পড়ার সময় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কলম ব্যবহার করা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। বইয়ের ভেতর অধিক হারে পার্শ্বটীকার উপস্থিতি পাঠকের গভীর মনোযোগ ও নিমগ্নতার প্রমাণ বহন করে। পড়ার সময় কলম ব্যবহার করলে পাঠকের মনোযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। পঠিত বিষয়ে নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করা পাঠকের উপলব্ধি ও অনুধাবনের স্বাক্ষর বহন করে। যখন আপনি পড়বেন এবং বিভিন্ন উপকারী টীকা-টিপ্পনী দিয়ে পৃষ্ঠার চারপাশ ভরে ফেলবেন তখন বুঝবেন যে, আপনার অধ্যয়ন ও চিন্তার সাথে পড়ার সম্পর্কসাধন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে লেখাগুলো হতে হবে পৃষ্ঠার পাশে, উপরিভাবে কিংবা নিচের দিকে। সেই সাথে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন বইগুলো নিজস্ব ও ব্যক্তিমালিকানাধীন হয়। অন্যথায় যদি সেগুলো অন্য কারো কিংবা পাঠাগারের হয়ে থাকে তবে তাতে কোনক্রমেই কিছু লেখা যাবে না।

পার্শ্বটীকাগুলো এমন হওয়া উচিত যাতে মনে হয় যে, সেগুলো পাঠক ও লেখকের মধ্যকার কথোপকথন। সেই

সাথে তা উপকারী ও ফলদায়কও হওয়া চাই। অন্যথায় শুধু কিছু চিহ্ন আর আঁকিবুকি বলে যেন মনে না হয় সেগুলোকে। সাধারণ পাঠাগারের বইগুলোতে এই ধরনের দুঃখজনক চিত্র আমরা অনেক সময় দেখতে পাই; যা মোটেই উচিত নয়। এর দ্বারা মূলত এসব যারা করে থাকে তাদের অজ্ঞতা-মূর্খতা আর বাড়াবাড়িরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

* দাগ এমনভাবে টানা উচিত, যাতে করে তা প্রধান লক্ষণীয় বিষয় বা মূল গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটাকে চিহ্নিত করে।

[টীকা : ইতিপূর্বে উলামায়ে কেরামের মধ্যে শব্দের উপরে দাগ টানার প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেকে শব্দের নিচেও দাগ টেনে থাকেন।]

* কোন প্যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলে কিংবা ইতিপূর্বে এই আলোচনা অন্য কোথাও অতিবাহিত হয়ে থাকলে পাশে দাগ টানার মাধ্যমে তা চিহ্নিত করা।

পাঠ্যবই বেশি বড় ও মোটা হলে যেসব কাজ করা যেতে পারে তা হল : বিভিন্ন রঙের কলম ব্যবহার করা। যেমন, মুখস্তকরার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন নিয়ম অথবা এই জাতীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হলুদ রঙ দিয়ে চিহ্নিত করা।

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অংশকে সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করা। যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ১. গুরুত্বপূর্ণ ২. সাধারণ ৩। এই পদ্ধতিটি আপনাকে সময় স্বল্পতার কালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আলোচনা

করতে সাহায্য করবে। অথবা যখন আপনি নতুন করে বইটি পড়ার ইচ্ছা করবেন কিংবা বইটির নির্দিষ্ট কিছু বিষয় আরো ভালো করে আত্মস্থ করে নিতে চাইবেন তখনও এই পদ্ধটি কাজে আসবে। এটি আধুনিক কোন পদ্ধতি নয়। অতীত যুগেও উলামায়ে কেরাম তাদের বিভিন্ন বই-পুস্তকে নানান রঙের ব্যবহার করেছেন।

এই বিষয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার বিশাল বড় গ্রন্থ 'আল ইসাবাহ ফি তামঈযিস সাহাবাহ' রচনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে বলেন, 'প্রথমে আমি লাল রঙ দিয়ে চিহ্নিত করেছি। তারপর হলুদ রঙ দিয়ে। তারপর এর সংমিশ্রন ঘটানো অন্য রঙ দিয়ে। এসব কিছুই পরিচয়হীন নারী পুরুষের অধ্যায় রচনার পূর্বের কথা।'

[ইবনে হাজার আল আসকালানী ওয়া দিরাসাতু মুসান্নাফাতিহী ও মানহাজিহিল ওয়ারিদি ফি কিতাবিহিল ইসাবাহ : ৬৯৯]

* ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা। যাতে করে তা আত্মস্ত করা সহজ হয়। এটি পাঠকের ভেতর অধ্যয়নকে আরো পোক্ত করার অনুভূতিকে জাগ্রত করে।
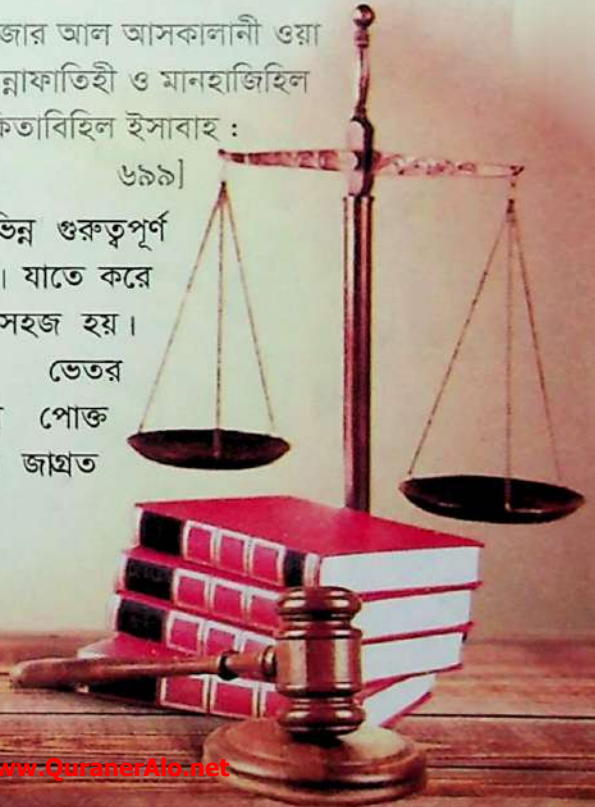
* বর্তমানে যে বিষয়ে পড়ছেন তার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অন্য যে পৃষ্ঠায় রয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে রাখুন। উদাহরণস্বরূপ : এভাবে লিখতে পারেন 'অত নাম্বার পৃষ্ঠায় দেখুন'। অথবা 'অমুক পৃষ্ঠায় এই সংক্রান্ত আলোচনা অতিবাহিত হচ্ছে।' এগুলোও পাঠকের মনোযোগিতার প্রমাণ বহন করে এবং উভয় বিষয়ের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরিতে সহায়তা করে।

* যে বিষয়গুলো সহজে বুঝে আসছে না ভবিষ্যতে কাউকে জিজ্ঞেস করার জন্য সেগুলো চিহ্নিত করে রাখুন। নির্দিষ্ট কোন বিষয় পড়ার সময় অন্তরে যেসব প্রশ্ন জাগ্রত হয় সেগুলোও টুকে রাখুন। তাহলে পরবর্তীতে কোন জ্ঞানী মানুষের সাথে সাক্ষাত হলে তার কাছ থেকে জানতে চাওয়ার মতো প্রশ্ন আপনার কাছে আগে থেকেই প্রস্তুত করা থাকবে।

* পার্শ্বটীকায় প্রয়োজনীয় কোন অংশ বা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা সংক্ষেপে লিখে রাখুন। অনেক বইয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায় মুহাক্কিক বা লেখক নিজেই প্রচুর পরিমাণে পার্শ্ব-শিরোনাম যুক্ত করে থাকেন। পূর্ববর্তী অনেক উলামায়ে কেরামের পঠিত বই-পুস্তকে প্রচুর পরিমাণে পরিচ্ছেদ থাকে। যুৎসই মুখস্থশক্তি আর শক্তিশালী স্মরণশক্তির

কারণে প্রতিটি পরিচ্ছেদেই তারা অসংখ্য তথ্যের সমাহার ঘটিয়ে থাকেন। ফলে পাঠকের জন্য বোঝার সুবিধার্থে ও আয়ত্ত করার সহজার্থে সেগুলোকে ছোট ছোট ভাগে আলাদা করে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। পার্শ্ব-শিরোনামের এই হল ফায়দা। এমনিভাবে এটি পাঠককে পঠিত বিষয় পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ্ করতেও সহায়তা করে। কারণ এর দ্বারা তার সামনে প্রতিটি পরিচ্ছেদের মূল কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পার্শ্ব-শিরোনামে যেসকল বিষয় চিহ্নিত করা যেতে পারে তা হল, আভিধানিক সংজ্ঞা, পারিভাষিক ও শরঈ সংজ্ঞা, আলেমদের উক্তি, প্রধান্যপ্রাপ্ত মত, আপত্তি ও তার উত্তর, সংশয় ও তার নিরসন, আলোচনার সারাংশ ইত্যাদি।

* লেখক সামনে যা বলবেন আগেই তা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালানো। অথবা তিনি সম্ভাব্য যেসব দিক লেখার মধ্যে তুলে ধরবেন সেগুলো নিয়ে আগে থেকেই চিন্তা-ভাবনা করা।

উদাহরণস্বরূপ, একজন তালিবুল ইলম ইখতিলাফবিশিষ্ট ফিকহের কোন মাসআলা পড়ার সময় সেই মাসআলায় ইমামদের কী কী মত থাকতে পারে তা নিজে থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। কারণ এই জাতীয় প্রচেষ্টা পাঠকের ভেতর উদ্ভাবন ক্ষমতা তৈরি করে এবং বিভিন্ন মতের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো আবিষ্কার করার মানসে মস্তিষ্ককে নানামুখী করার যোগ্যতা
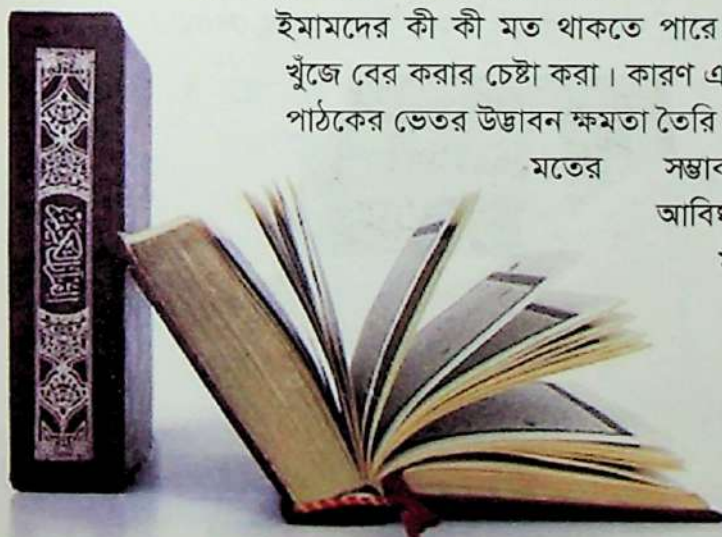
সৃষ্টি করে। একজন ছাত্রের ভেতর ফিকহী দক্ষতা তৈরিতে এটি অত্যন্ত সহায়ক। মূলত এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা পাঠককে বক্তেব্যের গভীরে নিয়ে যায়। ফলে খুব সহজেই পঠিত বিষয়টি তার অন্তরে গেঁথে যায় এবং অমনোযোগিতা দূরীভূত হয়।

* টীকা সংযুক্তকরণ এবং বিভিন্ন উপকারী বিষয় সংযোজনের মাধ্যমে গ্রন্থকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করা। যেমন, হাদীসের সহীহ-যঈফ নির্ণয়ক গ্রন্থ থেকে উক্ত বইটিতে উল্লেখিত হাদীসগুলোর বিশুদ্ধতার মান চিহ্নিত করে দেওয়া। অথবা অন্য কোন সূত্র থেকে নতুন তথ্য সংযোজন করা। যেমন, বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হওয়া দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয়ের একটি দিক যদি লেখক উল্লেখ করে থাকেন, তবে পাঠক তার পূর্বের পড়া অন্য সূত্র থেকে আরো কয়েকটি সমন্বয়ের দিক সেখানে উল্লেখ করে দিতে পারেন। এমনিভাবে কোথাও যদি বলা হয় এই বিষয়ে আরো অনেক মতামত রয়েছে, তাহলে নিজের জানা তথ্য থেকে বা অন্য কোন সূত্র থেকে সেসব মতামতগুলো টীকায় উল্লেখ করে দেওয়া।

লেখকের কোথাও ভুল হলে সেটা চিহ্নিত করা। তার বিশেষ কোন চিন্তাধারার পর্যালোচনা করা। এই ক্ষেত্রে পাঠক পার্শ্বটীকায় লিখে দিবেন, 'এখানে লেখকের ভুল হয়েছে, সঠিক হবে এই।' সঠিক বিষয়টি যে সূত্র থেকে বর্ণনা করছেন সেটাও তুলে ধরবেন।

* মুদ্রণ-প্রমাদ ঠিক করতে ভুলবেন না। সেসব পুস্তক-ব্যবসায়ীর বই-পুস্তকে এগুলো বেশি পরিলক্ষিত হয়, যারা আল্লাহ তাআলাকে যথাযথভাবে ভয় করে না। যেসব লেখক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা অমান্য করে তাদের লেখাতেও এই ধরনের ভুলের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কারণ তিনি ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন যে, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করবে তখন তা সুচারুরূপে করবে।'

[বাইহাকী, শুআবুল ঈমান : ৫৩১৩, তবারানী, মুজামুল আওসাত : ৮৯৭, আলবানী রাহ. একে হাসান বলেছেন]

* এটি এমন একটি বিষয়, যার জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিস্তৃত পড়াশোনার প্রয়োজন হয়। যেমন, কোন এক কবি বলেছেন–

كَمْ مِنْ كِتَابٍ قَدْ تَصَفَّحْتُهُ * وَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ قَدْ أَصْلَحْتُهُ

حَتَّي إِذَا طَالَعْتُهُ ثَانِيًا * وَجَدْتُ تَصْحِيْفًا فَصَحَّحْتُهُ

কতো বই ভালো করে পড়েছি; তারপর বলেছি, ঠিক আছে। পরে তা যবে ফের পড়েছি; ভুল পেয়ে ঠিক করে দিয়েছি।

ইমাম মুযানী রাহ. বলেছেন, "আমি 'রিসালাহ' নামক গ্রন্থটি ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর কাছে প্রায় আশিবার পড়েছি। প্রত্যেক বারই কোন না কোন ভুল ধরা পড়েছে। তখন ইমাম শাফেয়ী রাহ. বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। এবার ক্ষান্ত হও। আল্লাহ তাআলা হয়ত চান না যে, তাঁর গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণ রকম ভুলমুক্ত হোক।"

[কাশফুল আসরার : ১/১০]

* সাধারণ পাঠকের কর্তব্য হচ্ছে, উলামায়ে কেরামের সামনে বিনয়ী ও শ্রদ্ধাবনত হওয়া। পূর্ব জ্ঞান ছাড়া নিজস্ব মতের ভিত্তিতে তাড়াহুড়া করে তাদের ভুল চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে যাওয়ার মতো বোকামী না করা। বড় বড় আলেমদের বিপরীতে তো আমরা কিছুই না। আবু আমর ইবনুল আলা রাহ. তার পূর্ববর্তী আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, 'অতীত হয়ে যাওয়া আলেমদের বিপরীতে তো আমরা লম্বা কোন খেজুর গাছের শেকড়ে জন্ম নেওয়া সামান্য উদ্ভিদের সমতুল্য।'

[আল মুদিহ লি আওহামিল জাময়ি ওয়াত তাফরীক : ১/৫]

সুতরাং তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। বরং পরিপূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল সংশোধন করবেন। কারণ পাঠক অনেক সময় ভুল নয় এমন বিষয়কেও ভুল মনে করে বসে থাকে।

ফলে দেখা যায়, তিনি যা সংশোধন করলেন সেটা ভুল আর বইয়ে উল্লেখিত বক্তব্যটিই সঠিক।

মূলত ধীরসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

[এটি মারফু হাদীস, যা ইমাম বাইহাকী রাহ. তাঁর শুআবুল ঈমান গ্রন্থে আনাস রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং ৪০৫৮, হাদীসটি যঈফ]

সংশোধন করার সময় পেন্সিল জাতীয় খুব চিকন কালির কলম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, যাতে করে পরবর্তীতে নিজের সংশোধনীটা ভুল প্রমাণিত হলে তা মুছে ফেলা যায়। সংশোধনটা শব্দের উপরে বা পার্শ্ব-টীকাতে করা উচিত। সেই সাথে সংশোধনের জায়গাটা দাগ টেনে চিহ্নিত করে দিলে আরো ভালো হয়।

বইয়ের ভুলগুলো সংশোধন করা হলে মালিকের কাছ এর মূল্য আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সংশোধিত কপিটি তার কাছে হয়ে ওঠে খুবই প্রিয়।

বইপড়া শেষ হলে কভারের গায়ে 'পাঠ-মূল্যায়ন' লিখে রাখতে পারেন। চাই সেটা বইয়ের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত হোক, কিংবা ভাষা-রীতি ও উপস্থাপনা শৈলী সংক্রান্ত হোক। কেননা যিনি মুরুব্বি ও দাঈ, মানুষদেরকে নানান বিষয়ে শিক্ষা দেন, তার জন্য কর্তব্য হল, এই কাজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া যে, কাদেরকে এই বই পড়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

* বইয়ের বিষয়বস্তুগুলোর সংক্ষেপণ করা। পাঠ-মূল্যায়ন তৈরির ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হয়ে থাকে। সেই সাথে ভবিষ্যতে যখন পাঠক পুনরায় বইটি পড়ার ইচ্ছা করবেন তখন এটি তার সামনে পুরো বইয়ের বিষয়বস্তুগুলো তুলে ধরবে।

স্বল্প সময়ের ভেতর তিনি এই সংক্ষিপ্তসার পড়েই অনেক বিস্তারিত আলোচনা স্মরণ করতে পারবেন।

সংক্ষেপণ একটি আলাদা শাস্ত্র। যে কেউ চাইলেই তা সুন্দরভাবে করতে পারে না। সেজন্য প্রথমেই আপনাকে পুরো বইয়ের বিষয়বস্তুগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। তারপর আপনি সেগুলো সংক্ষেপণ করতে সক্ষম হবেন এবং মূল বইয়ের বক্তব্যগুলোকে নিজের মতো করে সাজিয়ে সম্পাদনা করে নিতে পারবেন। তবে কোথাও যদি লেখকের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তবে তাকে এভাবেই রেখে অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করবেন।

অনেক সময় কোন কোন শিক্ষার্থী সংক্ষেপণের সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনে ভুল করে থাকে। যার ফলে সে হাস্যকর কাণ্ডকীর্তির জন্ম দেয়। আপনি দেখবেন, সে ভূমিকা থেকে দুই লাইন, এখান-সেখান থেকে কয়েক লাইন নিয়ে সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু কথার মাঝে সামঞ্জস্য এবং একটি বাক্যের সাথে অপরটির সম্পর্কের প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখে না। সবশেষে লেখকের শেষ ক'টা লাইন আর সালাম জুড়ে দিয়ে তার সংক্ষেপণ কর্মের ইতি ঘটায়।

২১. যথাযথ দ্রুততার সাথে পড়তে পারে।

যথাযথ দ্রুততার সাথে পড়াটা পঠিত বিষয়ের ধরন এবং পড়ার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। পত্র-পত্রিকার গল্প-কাহিনী গভীর জ্ঞানগত বিষয় পড়ার তুলনায় অনেক দ্রুত পড়া যায়। পড়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও গতির উপর প্রভাব ফেলে। যদি পড়ার উদ্দেশ্য হয় বোঝা ও অনুধাবন করা তাহলে সেক্ষেত্রে এমনিতেই ধীরস্থিরতা চলে আসে। আর যদি উদ্দেশ্য হয় মুখস্থ পড়াকে পুনরায় ঝালাই করে নেওয়া তাহলে পড়ার গতি স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি বেড়ে যায়।

দ্রুত গতিতে পড়ার আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে কোন বই সম্পর্কে জানা বা নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে হাতে নেওয়া। কারণ অনেক সময় এমন হয় যে, ধীরে সুস্থে পড়ে দেখার সুযোগ থাকে না। ফলে পাঠক প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম দিকের কয়েক লাইনের উপর

নজর বুলিয়ে থাকেন।

আবার অনেক সময় পূর্বে পড়া কোন বিষয় খোঁজার সময় কিংবা কোন বই ক্রয় করার জন্য যাচাই-বাছাই করার সময়ও সাধারণত দ্রুত গতিতে পড়া হয়ে থাকে।

অনেক সময় এর চেয়েও দ্রুত গতিতে পড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন, কেউ একটি বইয়ের নির্দিষ্ট কোন পরিচ্ছেদ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। তখন সে শুধু বিষয়সূচী পড়ে যাবে কিংবা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকবে।

নিরীক্ষার জন্য পড়ার দৃষ্টান্ত আমরা ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর জীবনীতে পাই। একবার তাঁকে 'ইজমা'-এর দলিল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। তখন তিনি প্রতিরাতে পুরো কুরআনুল কারীম নিরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তিনবার করে পড়তে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত দলিলটি খুঁজে পেয়েছিলেন। সেটি হল কুরআনের এই আয়াত–

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾

অর্থাৎ, যদি আপনি নিজের পড়ার গতি যথোপযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আস্তেআস্তে পাঁচ মিনিট পড়ুন। এরপর দেখুন মোট শব্দসংখ্যা কত হল। তারপর ওই সংখ্যাটিকে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিন। যদি দেখেন ভাগফল ১৫০ হয়েছে তাহলে এটি পরিমাণে কম বলে গণ্য হবে, যার মানে হচ্ছে আপনার পড়ার গতি ধীর। আরো দ্রুত গতিতে পড়ার চেষ্টা চালাতে হবে আপনাকে।

এই বিষয়ে বিজ্ঞজনদের কিছু পরামর্শ তুলে ধরা হল :

* অর্থের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে প্রতিদিন পাঁচ মিনিট করে দ্রুত পড়ার চেষ্টা করুন। দেখবেন, এক মাসের মধ্যে আপনি আগের চেয়ে আরো দ্রুত গতিতে পড়তে পারছেন।

* পড়ার সময় দৃষ্টির পরিধিকে প্রশস্ত করুন। প্রতিটি যতিচিহ্নে ক্ষান্ত হবার সময়-কালকে কমিয়ে আনুন।

* ঠোঁট নাড়ানো বা আওয়াজ করা ছাড়াই নিঃশব্দে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। অপরিচিত শব্দের প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কারণ অধিকাংশ সময় আগ-পিছ থেকে এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

* উপরোক্ত পরামর্শগুলো যত্নের সাথে পালন করলে একটা সময় আপনি নিজেই পড়ার গতি বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি অনুভব করবেন।

উলামায়ে কেরামের জীবনীতে দ্রুত গতিতে পড়ার যেসব ঘটনা পাওয়া যায় সেগুলো অত্যন্ত আশ্চর্য ধরনের। নিম্নে এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরা হল–

প্রথম ঘটনা : খতীবে বাগদাদী রাহ. মক্কা মুকাররমাতে মাত্র তিন মজলিসে ইসমাঈল ইবনে আহমাদ হিয়ারী রহ. এর নিকট সহীহ বুখারী শ্রবণ করেন, যার দুইটি ছিল দুই রাতে।

মাগরিবের সময় শুরু হয়ে সেগুলো ফজরের সময় এসে শেষ হয়েছিল। আর তৃতীয় মজলিসটি ছিল দুপুর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত। আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. বলেন, আমাদের যুগে কেউ এমনটা পারবে বলে আমার জানা নেই। এটা সহজ হওয়ার পেছনে মনে হয় সেই যুগে সময়ের মধ্যে বরকত থাকার বিষয়টি কার্যকর ছিল। [কাওয়ায়েদুত তাহদীদ : ২৬২]

দ্বিতীয় ঘটনা : খতীবে বাগদাদী রাহ.-এরই আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায়। তা হল মীনার দিনগুলিতে তিনি কারীমা মারওয়াযিয়া রাহ. এর নিকট সহীহ বুখারী পড়েছিলেন। [আল জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরার ফি তারজামাতি শাইখিল ইসলাম ইবনে হাজার : ১০৪]

তৃতীয় ঘটনা : ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. সুনানে ইবনে মাজাহ মাত্র চার মজলিসে

পড়েছিলেন। সহীহ মুসলিমও তিনি চার মজলিসেই পড়েছিলেন। তবে শেষ মজলিসটি দুই দিনেরও কিছুটা বেশি সময়ে হয়েছিল।

ইমাম নাসাঈ রাহ. এর সুনানে কুবরা তিনি দশ মজলিসে পড়েছিলেন। প্রত্যেক মজলিসের সময়সীমা ছিল চার ঘণ্টা করে। এর চেয়েও দ্রুত গতিতে পড়ার যে ঘটনা তার জীবনে ঘটেছিল তা হল, ইমাম তাবারানী রাহ. এর মুজামে সগীর গ্রন্থটি যোহর থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত সময়ে মাত্র এক মজলিসে পড়ে শেষ করেছিলেন। গ্রন্থটি এক খণ্ডে এবং তাতে প্রায় দেড় হাজার হাদীস রয়েছে, তিনি সহীহ বুখারী দশ মজলিসে বর্ণনা করেছিলেন, প্রত্যেক মজলিসের সময় সীমা ছিল চার ঘণ্টা করে। [প্রাগুক্ত : ১০৩]

চতুর্থ ঘটনা : ইবনে হাজার রাহ. দিমাশক অবস্থান কালে প্রায় একশত খণ্ড অধ্যয়ন করেছিলেন। সেখানে তার অবস্থান ছিল দুই মাসেরও কিছুটা বেশি সময়কাল।
[হাফেজ ইবনে হাজার : ২৮৯]

Contents

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আমাদের পক্ষে এমন অল্প সময়ে অধিক পড়া সম্ভব নয়। বরকতের দিক দিয়ে আমাদের যুগ তাদের যুগের মতো নয়। উচ্চমনোবল আর হিম্মতের দিক দিয়েও আমরা তাদের সমতুল্য নই। তবুও এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, ধৈর্যসহকারে লাগাতার বহু সময় পড়তে পারার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং সাহস যোগানো।

কবি বলেন–

فَتَشَبَّهُوْا إِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ * إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ

ভালো মানুষ না হলেও; তাদের আকার ধরো। তাদের আকার ধরার মাঝে; সফল হতে পারো।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মূল বিষয় হল পঠিত বিষয়টি বুঝতে পারা ও অনুধাবন করা। পড়তে পড়তে পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করা বা খণ্ডের পর খণ্ড শেষ করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ অনেক সময় পড়তে গিয়ে বেশি তাড়াহুড়োর কারণে পঠিত বিষয়গুলো ভালো ভাবে বোঝা পাঠকের জন্য সম্ভব হয় না।

২২. পড়ার জন্য আরামদায়ক স্থান নির্বাচন করা।

পড়ার মনোযোগ ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য এটি সহায়ক হয়ে থাকে। এই বিষয়ে আরো কিছু পরামর্শ নিম্নে প্রদত্ত হল–

* পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা। কেননা অল্প আলোতে চোখ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

* প্রদীপ বা লাইট এমন স্থানে স্থাপন করা, যাতে অন্য কিছুর ছায়া বইয়ের উপর এসে না পড়ে।

* বইকে এমন স্থানে রাখা, যাতে করে আলো সমানভাবে সেখানে পৌছতে পারে।

* পড়ার জন্য আরামদায়ক ভঙিমায় বসা। এই বিষয়ে বিজ্ঞলোকদের পরামর্শ হল, পিঠ সোজা বরাবর থাকবে। বই থাকবে শরীরের মাঝামাঝি অবস্থানে। মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুকানো থাকবে। যাতে করে চোখ সরাসরি বইয়ের উপর দৃষ্টি ফেলতে পারে। বই আর চোখের মাঝে আনুমানিক ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্ব থাকবে।

তবে শুধু এই এক পদ্ধতিতেই পড়তে হবে তেমন নয়। কারণ সব সময় এটি স্বাচ্ছন্দময় নাও হতে পারে। আমাদের পূর্ববর্তী

উলামায়ে কেরাম চাঁদের আলোতে এবং সূর্য ও মোমের আলোতে পড়াশোনা করতেন।

তারা দাঁড়িয়ে বসে পড়তেন। হাঁটতে হাঁটতে এমনকি উপুড় হয়েও পড়তেন। আমাদের যুগের অনেক মুহাদ্দিস তো সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তেন। মোটকথা এখানে বোঝানো উদ্দেশ্য হল : পড়ার জন্য এমন উপযোগী পদ্ধতি বেছে নেওয়া যাতে করে যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় পড়া সম্ভব হয়। এর কারণ হল, অনেক মানুষ এমনভাবে পড়তে বসে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই পা ঝিমঝিম করা শুরু করে। ঘাড় ও চোখ ব্যথা হয়ে যায়। ফলে সে পড়া ছেড়ে দেয়। সুতরাং পড়ার ধরন সম্পর্কে অবগতি থাকাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তবে ক্লান্তি অনুভূত হলেই সামান্য বিশ্রাম নেওয়া অত্যন্ত ফলদায়ক। যদিও তা সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য হয়। এতে করে পুনরায় নব উদ্যোমে পড়া শুরু করা সম্ভব হয়।

পড়ার সময় চোখের দৃষ্টির স্বল্পতা কিংবা ব্যথা অনুভব করলে যথাসম্ভব ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় চশমা ব্যবহারেরও প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

২৩. পড়ার জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা।

শারিরীক ও মানসিক শ্রমের পর পড়তে বসলে সেটা থেকে খুব বেশি উপকার পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে বিশ্রাম নিয়ে পড়তে বসলে সেটা বেশি উপকারী ও গভীর ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। সেজন্যই ঘুম থেকে উঠার পরের সময়টা হচ্ছে পড়ার জন্য সবচে উত্তম সময়। এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, তন্দ্রা অবস্থায় পড়ার তুলনায় বিশ্রাম নিয়ে ঘুম থেকে উঠার পর পড়লে সেটা বেশি ফলপ্রসু হয়। এই কারণেই স্কুল-মাদরাসার ক্লাস টাইম সেভাবেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

সকাল বেলায় পড়া হল সবচে উত্তম। এই সময় বরকত থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মতের সকালের সময়ে তুমি বরকত দান করো।'

[আবু দাউদ : ২৬০৬, তিরমিজি : ১২১২,
আলবানী রাহ. একে সহীহ বলেছেন

তবে এই উত্তম হওয়াটা অন্যান্য সময়ে পড়ার বিষয়ে প্রতিবন্ধক নয়। বিশেষ করে ছাত্রদের বেলায়। এছাড়াও অন্যান্য সময়ে পড়াটা খারাপ নয় এই জন্যে যে, সাধারণত দেখা যায় মানুষ কাজ-কর্ম আর অন্যান্য প্রয়োজন শেষ করে ঘুমের পূর্বের সময়টাতে পড়ার মত ফুরসত পায়। অনেকে আবার শিশু সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে ঘরবাড়ি নিরব হওয়ার পরে বই পড়ার
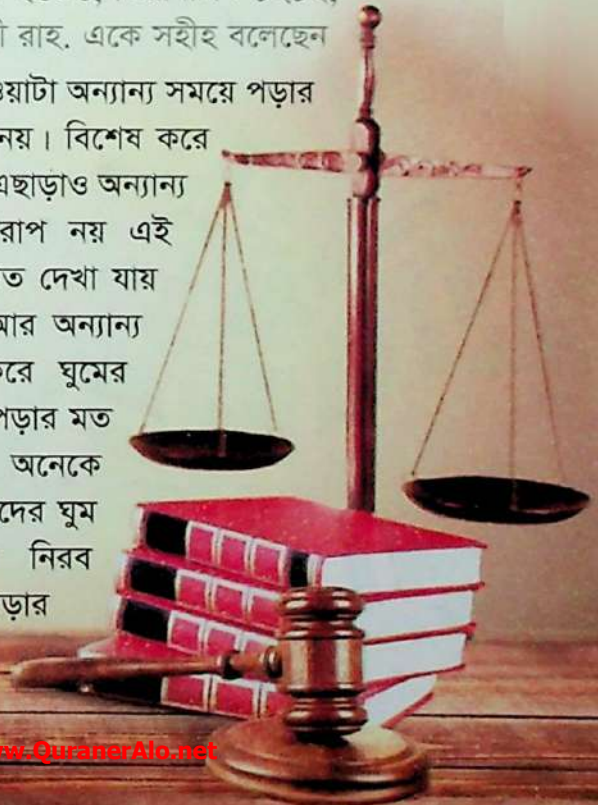
সুযোগ পায়। অধিকাংশ চাকুরিজীবী আর কাজ-কর্মে ব্যস্ত মানুষদের বেলাতেই এমনটা ঘটে থাকে। ফলে তাদেরকে এই সময়গুলোই বেছে নিতে হয়।

২৪. পড়ার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।

সে জন্য পাঠককে এমন একটি স্থান বেছে নিতে হবে যেটা শান্ত ও নিরব। চিৎকার চেচামেচী মুক্ত।

(টীকা : খতীব বাগাদাদী রাহ. বলেছেন, মুখস্থ করার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে নিরব কামরা এবং প্রত্যেক এমন জায়গা, যা আমোদ-প্রমোদ থেকে মুক্ত থাকে। নদী-নালা রাস্তা ঘাট ও চিৎকার চেচামেচিযুক্ত স্থান মুখস্থের জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ এগুলো অধিকাংশ সময় মনোযোগ সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হয়। [তাযকিরাতুস সামে ওয়াল মুতাকাল্লিম : ৭৩]

আপনি যদি পাবলিক লাইব্রেরি বা সাধারণ পাঠাগারের দিকে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন যে, সেগুলোতে বসার জায়গাটা সামনে ও ডানে-বামে দেওয়াল বেষ্টিত থাকে। যাতে করে পাঠকের দৃষ্টি সব সময় বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তার মস্তিষ্ক এদিক-ওদিক বিশৃংখল হয়ে মনোযোগ বিনষ্ট না হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, এমন উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা যদি না

থাকে তাহলে মনোযোগ সৃষ্টির চেষ্টাতে অথবা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে অন্তত যাতে কোন ত্রুটি না থাকে।

২৫. পাঠকের কর্তব্য হচ্ছে, পড়ার সময় মনোযোগ বিনষ্ট করে এমন সব বিষয়কে পরিহার করা। যেমন ফোন এলেই তা রিসিভ করা, দরজায় কেউ কলিংবেল টিপলেই খোলার জন্য নিজে উঠে যাওয়া। যে কোন কাজেই নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চাওয়া। অবশ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ হলে সেটা ভিন্ন কথা। যেমন, বাবা-মা যদি ডাক দেয় তবে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া। এমনিভাবে অন্যান্য যেসব কাজ পড়ার চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো করাতেও কোন সমস্যা নাই। তবে অবশ্যই কাজ সেরে দ্রুত আবার পড়তে আসার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। যাতে করে উদ্যমতা ও আগ্রহ-স্পৃহা ঝিমিয়ে না পড়ে।

পড়ার সাথে অন্য কিছু শোনা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ মানুষের অন্তর হল একটি। আর এক অন্তর দিয়ে এক সাথে দুই কাজে মনোযোগ দেওয়া কষ্টকর।

সেসব পাশ্চাত্য কাফেরদের কথার প্রতি আপনার ভ্রুক্ষেপ করার কোন দরকার নেই, যারা বলে যে, শান্ত প্রকৃতির বাদ্য-সঙ্গীত পড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। যেসব ছাত্ররা গান-বাজনা শুনতে শুনতে পড়তে বসে এবং একাগ্রতা হারানোর পাশাপাশি গুনাহে লিপ্ত হয়

তাদের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন নেই।

পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং পড়া থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদানের পর এবার আমরা বই-পুস্তক সংগ্রহ করার বিষয়ে কিছু সাধারণ উপদেশ উপস্থাপন করবো।

বই পুস্তকের যত্ন নেওয়া

পাঠকের উচিত বইয়ের যত্ন নেওয়া। চাই সেটা নিজের হোক কিংবা অন্যের। যাতে করে এর থেকে উপকৃত হওয়ার ধারা অব্যাহত রাখা যায়। এই জাতীয় বই পড়ার প্রতি মন বেশি ধাবিত হয়। আমাদের উলামায়ে কেরাম তাদের বই-পুস্তকের প্রতি অত্যধিক যত্নশীল ছিলেন। তাদের কেউ একজন বলেছেন, ' তোমার বইকে বাঁশি এবং বাকশো বানিয়ো না।'

অর্থাৎ, বইকে এমনভাবে মুড়িয়ে ফেলো না যে, দেখতে বাঁশির মত মনে হয়। আবার এর উপর খুব বেশি জিনিস পত্রও রেখো না। যার ফলে মনে হয় এটি কোন বাকশো। কারণ এই উভয়টিই দ্রুত বইকে নষ্ট করে ফেলে। উলামায়ে কেরাম এতো বেশি সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন যে, তারা বই কিভাবে রাখতে হবে সে বিষয়েও নির্দেশনা দিয়েছেন। বলেছেন—

যে বিষয়গুলো বইকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলো পরিহার করা উচিত। এমন কিছু বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১. বই উল্টা করে রাখা। কিংবা দীর্ঘ সময় খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা।

২. খুব জোরে শক্তি প্রয়োগ করে বই খোলা। অথবা হাত দিয়ে লেগে থাকা পৃষ্ঠা ছুটানো। কিংবা পৃষ্ঠা উল্টানোর জন্য আঙ্গুলে অতিরিক্ত থুথু ব্যবহার করা।

৩. বই একটাকে অপরটার উপর রাখা। বরং উচিত হল, পাশাপাশি করে রাখা।

৪. ছোট আকৃতির বইয়ের উপর বড় ধরনের বই রাখা। যার ফলে অনেক সময় বই পড়ে গিয়ে কভার খুলে যায় এবং বই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৫. পাঠাগারের তাকে বইকে কাত করে রাখা। অথচ সঠিক পদ্ধতি হল বইকে সোজা অবস্থায় রাখা।

৬. বইয়ের পৃষ্ঠা খুব দ্রুত ও বল প্রয়োগ করে উল্টানো। ছাপাখানায় কাটিংয়ের ভুলের কারণে অনেক সময় পৃষ্ঠা একটা অপরটার সাথে লেগে থাকে। সেটা খুলতে গিয়ে এলোপাথাড়ি জোরাজুরির আশ্রয় না নেওয়া। এক্ষেত্রে ছুরি বা কেচির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। যুক্ত থাকা সব পৃষ্টা একে একে খুলে নেওয়া। যাতে করে বারবার পড়ার মাঝে বিরতি দিতে না হয়।

৭. বইকে বালিশ, হাতপাখা, পেষণযন্ত্র কিংবা খাদ্য-পানীয় রাখার দস্তরখান হিসেবে ব্যবহার করা।

একজন জ্ঞানী একবার এক লোককে বইয়ের উপর বসে আছে দেখে বললেন, 'কী আশ্চর্য! সে নিজের কাপড়ের হেফাজত করছে অথচ বইয়ের হেফাজত করছে না। অথচ কাপড়ের তুলনায় বইয়ের হেফাজত বহুগুণে উত্তম।' [তাকয়ীদুল ইলম : ১৪৭]

যেসব জিনিসের উপর খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি পড়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো থেকে বইকে যথাসম্ভব দূরে রাখা। বিশেষ করে সফর ও যাত্রাপথে এবং খাবার টেবিলে বসে পড়ার সময়ে।

৮. যেখানে এসে বিরতি দিয়েছে সেই জায়গা চিহ্নিত করে রাখার জন্য কাঠ বা শক্ত খসখসে জিনিস ব্যবহার করা।

৯. মোটা কঠিন কিংবা এমন ধারালো নিবের কলম দিয়ে লেখা, যা মূলত বইকে ছিদ্র করে ফেলে। বিশেষ করে সংশোধন করার সময়।

এমনিভাবে দুঃখজনক আরেকটি বিষয় হল, অনেক পাঠক পড়ার সময় বিভিন্ন দাগ টেনে ও নানা রকম চিহ্ন দিয়ে বইয়ের ভেতর-বাইরের আকৃতিকে বিকৃত করে ফেলে।

১০. ছড়িয়ে পড়া কালির কলম দিয়ে বইয়ের উপর কোন কিছু লেখার ক্ষেত্রে অসচেতন থাকা। উচিত হল, হাতের মধ্যে লেগে যায় কিংবা দাগ ফেলে দেয় এমন উপকরণাদী থেকে দূরে অবস্থান করা। যেমন কালী বা এ জাতীয় জিনিস। কারণ সেগুলো ধরা ও বহন করার সময় লেখকের হাত থেকে অনেক সময় বইয়ের গায়ে লেগে যায়।

১১. যে পৃষ্ঠাগুলো ছিড়ে গেছে, বা পুড়ে গেছে সেগুলো এভাবেই ফেলে রাখা। সেটা দ্রুত মেরামত করা বা টেপ দিয়ে জোড়া লাগানোর উদ্যোগ না নেওয়া। যদি পৃষ্ঠার অবস্থা এমন হয় যে, সেটা ঠিক

করা আর সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে ওই পৃষ্ঠাটি ফটোকপি করে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

১২. বই বহন করার সময় পেঁচিয়ে বাঁশির মতো বানানো। অথবা এমন বক্সে বই রাখা, যেখানে কলম-ডাস্টার ইত্যাদি রাখা হয়।

১৩. উপর থেকে বই নিক্ষেপ করা বা ছুড়ে মারা। উচিত হল, বই হাতে হাতে দেওয়া-নেওয়া করা। যাতে পৃষ্ঠা ছিড়ে না যায়।

১৪. বই পুস্তককে সরাসরি মাটির উপর স্তুপ করে রাখা। যার ফলে আদ্রতা ও পচনে আক্রান্ত হয়ে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকে। উত্তম হলো বই-পুস্তক কাঠের তাকের উপর বা পৃথকভাবে তৈরি রুমের পৃষ্ঠদেশে কিংবা পরিচ্ছন্ন আলমারিতে রাখা।

বই-পুস্তক যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে কোন এক কবি তার কবিতায় সেগুলোর কথা তুলে ধরেছেন এভাবে–

عَلَيْكَ بِالْحِفْظِ دُوْنَ الْجَمْعِ فِي * كُتُبٍ فَإِنَّ لِلْكُتُبِ آفَاتٌ تَفَرِّقُهَا

اَلْمَاءُ يُغْرِقُهَا وَ النَّارُ تُحَرِّقُهَا * وَ الْفَأْرُ يَخْرِقُهَا وَ اللِّصُّ يَسْرِقُهَا

বই কিনে না রেখে যতো পারো পড়ো; কোন দিন সেই বই হারাতেও

পারো। হয়তোবা পানিতে পড়ে যেতে পারে; আগুনেও বইগুলো ঝলসাতে পারে, কিবা ধরো ইঁদুরে সব কেটে দিল; অথবা চোর মশাই ভেগে নিয়ে গেল।

বই ক্রয় এবং সংগ্রহ বিষয়ক কিছু দিক-নির্দেশনা

যেসব কারণে মানুষ বই কিনতে আগ্রহী হয় সেগুলো হল–

বইয়ের মূল্য, লেখকের প্রসিদ্ধি, চিত্তাকর্ষক নাম, অন্যদের পরামর্শ, গবেষণার আগ্রহ, প্রয়োজন পড়ার দরুন, ছাত্রদের জন্য পাঠাগার তৈরির উদ্যোগ, বইয়ের ধরন, পৃষ্ঠার আভিজাত্য, ছাপার সৌন্দর্য, মূল্যের স্বল্পতা ইত্যাদি।

একজন মুসলিম পাঠকের, বিশেষ করে ছাত্রদের জন্য উচিত হল, এমন সব বই সংগ্রহ করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া, যার যথাসম্ভব প্রয়োজন পড়ে থাকে। চাই সেটা ক্রয় করার মাধ্যমে হোক কিংবা ভাড়ায় হোক বা ধারে হোক।

বই সংগ্রহ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

১. ভালো মানের বই-পুস্তকের পরিচয় জানা। আলেমদের কাছ থেকে বইয়ের তালিকা সংগ্রহ করার মাধ্যমে তা জানা যেতে পারে। এ ছাড়া অভিজ্ঞ ও বই বাছাইয়ে দক্ষতা রাখে এমন ব্যক্তিদের সাথেও ক্রয়ের পূর্বে পরামর্শ ও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

২. বই ক্রয় এবং সংগ্রহ করার পূর্ব প্রস্তুতি থাকা। এর জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা হল–

 ক. বর্তমানে আপনি যেসব বই কিনতে আগ্রহী তার একটা তালিকা তৈরি করা।

সেই সাথে ভবিষ্যতে সেগুলো কিনতে চাচ্ছেন তারও তালিকা তৈরি করা।

খ. বই কিনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিকারী বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বইগুলো নির্দিষ্ট করে রাখা। যাতে করে সময় এবং অর্থ স্বল্পতার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে না হয়।

গ. যেই লাইব্রেরিতে যাবেন তা সুনির্দিষ্ট করে রাখা।

ঘ. বিভিন্ন লাইব্রেরির বইমেলা ও প্রদর্শনীতে যেসব ছাড়ের অফার দেওয়া হয় সেসবের সৎব্যবহার করা।

৩. কুরআন-হাদীস সংক্রান্ত বই পুস্তক সংগ্রহের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা। বিশেষ করে তাফসীর, বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং শরীয়তের নানাবিধ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলী।

৪. মৌলিক ও সালাফে সালেহীনের লেখা জরুরি বইগুলো কেনার ব্যাপারে বেশি মনোগোযী হওয়া উচিত। এমন বইপত্র দিয়ে আপনার লাইব্রেরি বোঝাই করবেন না, যা সঠিক চিন্তা-চেতনাকে বিগড়ে দেয়। বিশেষকরে বেদআতীদের বই-পুস্তক ক্রয় করা থেকে সাবধান থাকুক। কেননা সেগুলো মারাত্মক ধরনের বিষয়। আপনার কর্তব্য হল এমন সব বই সংগ্রহ করা, যেগুলোতে সহীহ দলিল-প্রমাণ এবং সালাফে সালেহীনের বুঝ ও হুকুম আহকামের কারণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

ছাত্রদের পাঠাগারে যেসব বই থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল হাদীস ও সুন্নাহের প্রসিদ্ধ

মৌলিক গ্রন্থাবলী। যেমন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। সুনানে আরবা (অর্থাৎ সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরিমিযি, ও সুনানে ইবনে মাজাহ) মুসনাদে আহমাদ। এমনিভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহ. ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়িম রাহ. প্রমুখের রচনাবলী। ইবনে আবদুল বার রাহ. এর গ্রন্থাবলী। যার মধ্যে সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ হল মুয়াত্তা মালেকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত-তামহীদ'।

* ইবনে কুদামাহ রাহ. এর গ্রন্থাবলী। যার মধ্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হল 'আল-মুগনী'।
* শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. এর গ্রন্থাবলী। যেমন 'সিয়ারুআলামিন নুবালা' ও 'তারীখুল ইসলাম' ইত্যাদি।
* ইবনে কাসীর রাহ. এর গ্রন্থাবলী। যেমন, 'তাফসীরে ইবনে কাসীর', 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ' ইত্যাদি।
* ইবনে রজব রাহ. এর গ্রন্থাবলী। যেমন, 'জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, 'লাতাঈফুল মাআরিফ' ইত্যাদি।
* অন্যান্য মহান মনীষীদের গ্রন্থাবলী। যেমন, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. আল্লামা শাওকানী রাহ. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রাহ. আল্লামা সানআনী রাহ. মুহাম্মাদ আমীন শানকীতী রাহ. প্রমুখ নিষ্ঠাবান উলামায়ে কেরাম।

৫. তাহকীককৃত বা পরিমার্জিত বই-পুস্তক সংগ্রহ করার প্রতি যত্নশীল হওয়া। যেগুলোতে মূলপাঠ সঠিক ভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এবং হাদীসের মান উল্লেখ করা থাকে। যেমন, আল্লামা আহমাদ শাকের রাহ. ও শাইখ আলবানী রাহ. প্রমুখের বই-পুস্তক।

৬. ফিকহ ও ফতোয়া সংক্রান্ত বই-পুস্তক সংগ্রহ করা। যেগুলোতে ইবাদতের বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৭. সেসব লেখকদের বই-পুস্তক সংগ্রহে সচেষ্ট থাকা যাদের মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত, ইলমের গভীরতা সর্বজন জ্ঞাত। আল্লাহর পথে যাদের কষ্ট স্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা মানুষদেরকে ধোঁকা দেওয়া এবং সুনাম-সুখ্যাতি ও অর্থ-বিত্ত অর্জনের লোভে পড়া থেকে থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী।

৮. অপরিচিত লেখকদের বই কেনার সময় আগে ভেতরের কিছু অংশ ভালোভাবে পড়ে যাচাই করে দেখা। যাতে করে বইয়ের বিষয়বস্তু সুন্দর ও ভালো হওয়ার বিষয়ে নিশ্চয়তা অর্জিত হয়। অন্যথায় চিত্তাকর্ষক রং আর উন্নত ছাপা দেখে ধোঁকা খাওয়া মোটেই অসম্ভব কিছু নয়।

৯. উন্নত ও মজবুত মলাট দেখে বই কেনা।

১০. ময়লাযুক্ত দাগ ও মুদ্রণ দোষ থেকে মুক্ত বই ক্রয় করা। কারণ অনেক সময় পৃষ্ঠা একটা আরেকটার সাথে লেগে থাকে অথবা উল্টা হয়ে থাকে। এমনিভাবে অন্যান্য আরো যেসব দোষ-ত্রুটি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা।

১১. বই ক্রয় করার পূর্বে বিষয়সূচী ভালোভাবে দেখে নেওয়া। যাতে করে বইয়ে আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগতি লাভ করা

যায়। সেই সাথে সূচীপত্রে উল্লেখিত কিছু শিরোনামের সাথে ভেতরের পৃষ্ঠা মিলিয়ে যাচাই করে নেওয়া।

১২. বই ক্রয় করার সময় কর্তব্য হচ্ছে–

স্পষ্ট অক্ষরের পরিচ্ছন্ন ছাপার বই নির্বাচন করা। কারণ অক্ষর খুব বেশি ছোট হলে পড়তে বিরক্তি লাগে। একজন মনীষী বলেছেন–

'বেশি ছোট অক্ষরে লেখো না, তাহলে লজ্জিত হবে ও গালি খাবে।' অর্থাৎ, ছোট অক্ষরে লেখার পর যখন আপনি সেটা হেফাজত করে রাখবেন এবং এক সময় বৃদ্ধ হওয়ার পর আপনার চোখের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে তখন সেটা পড়তে না পারার কারণে নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হবেন। আর যদি সেটা আপনি আপনার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য লিখে যান তাহলে যখন তারা সেটা পড়তে যাবে তখন অক্ষর ছোট হওয়ার কারণে সহজে বিরক্ত হয়ে আপনাকে গালি দিবে।

১৩. এমন বই ক্রয় করার বিষয়ে যত্নশীল হওয়া, যেগুলোতে দাড়ি, কমা ইত্যাদি বিরাম চিহ্ন সঠিক ভাবে ব্যবহার

করা হয়েছে।

এমনি ভাবে যেসব বইতে অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদকে সুন্দরভাবে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। কারণ এগুলো বইয়ের বিষয়বস্তু সহজে অনুধাবনে সহায়ক হয়।

১৪. যখন আপনি এমন কোন বই ক্রয় করবেন যাতে মুদ্রণ-প্রমাদের তালিকা প্রদান করা আছে, সেক্ষেত্রে প্রথমেই আপনি যথাসম্ভব সেসব জায়গা সংশোধন করে নিতে সচেষ্ট হোন। কারণ, এটা যদি না করেন তবে অনেক ক্ষেত্রে ভুলসহ পড়ার আশংকা রয়েছে।

১৫. যখনই কোন বই ক্রয় করবেন সাথে সাথে সেটা আপনার পাঠাগারের তালিকাভুক্তির খাতায় অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।

ব্যক্তিগত পাঠাগার তৈরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কিছু পরামর্শ–

১. পরিচ্ছন্ন-শান্ত এবং শিশুদের নাগালের বাইরের কোন স্থান নির্বাচন করুন।

২. নানা রকম বিষয়ের বই-পুস্তক সংগ্রহ করার বিষয়ে যত্নশীল হোন। যেমন: তাফসীর, হাদীস ফিকাহ, আকীদা, সীরাত ও ইতিহাস, শিষ্টাচার, খোদাভীরুতা, উসুলুল

ফিকহ, মুস্তালাহুল হাদীস, মনীষীদের জীবনী, নাহু সরফ, ভাষা-সাহিত্য ও কাব্য। দাওয়াত, নারী ও পরিবার, মুসলমানদের অবস্থা, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

৩. প্রত্যেক শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা।

৪. বই সাজানোর ক্ষেত্রে সবার উপরে সবচে মর্যাদাশীল বই রাখবেন। এরপর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মর্যাদা অনুপাতে রাখবেন। যেমন প্রথমে কুরআন কারীম, তারপর হাদীস, হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ, আকীদা, উসুলুল ফিকহ, ফিকহ, নাহু, কবিতা ইত্যাদি।

যদি একই শাস্ত্রের দুইটি গ্রন্থ থাকে তাহলে যার মধ্যে কুরআন হাদীসের বেশি উদ্ধৃতি রয়েছে সেটাকে উপরে রাখবেন। যদি সেদিক দিয়েও সমান হয় তাহলে যেই লেখকের মর্যাদা বেশি তার বই উপরে রাখবেন। যদি এই ক্ষেত্রেও সমান হয় তাহলে রচনাকালের দিক দিয়ে যেটা বেশি প্রাচীন সেটাকে উপরে রাখবেন। এই ক্ষেত্রেও যদি সমান হয় তাহলে যে বইটা উলামায়ে কেরাম বেশি পড়েন সেটাকে উপরে রাখবেন। এই ক্ষেত্রেও যদি সমান হয় তাহলে যেটা সবচে বেশি বিশুদ্ধ সেটাকে উপরে রাখবেন।

এই ভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বইগুলো সাজাবেন।

৫. যে কোন বই আপনার হাতে আসার পর পাঠাগারে অন্তর্ভুক্ত করার আগে তার উপর যথাসম্ভব চোখ বুলিয়ে নিন। অথবা অন্ততপক্ষে ভূমিকা কিংবা সূচিপত্র পড়ে নিন। অথবা ভেতরের কিছু অংশ দেখে নিন। এরপর বইটিকে তার সমগোত্রীয় বইয়ের সাথে রাখুন। যদি এমনটা না করেন তাহলে হতে পারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে কিংবা আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সেই বইয়ের উপর কখনো দৃষ্টি বুলানোর সুযোগ আসবে না। এই কারণে অনেকে অপঠিত নতুন বইগুলোর জন্য পাঠাগারের নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৬. প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পাঠাগারের তাকে আলাদা শিরোনাম দিয়ে রাখা। এতে করে উপযুক্ত স্থানে বই রাখা সহজ হয়।

৭. নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পাঠাগারের জন্য আলাদা বইয়ের তালিকা তৈরি করা।

ক : বিষয়

খ বইয়ের নাম

গ লেখক

এর সাথে ক্রমিক নংও যুক্ত করে দিবেন। যাতে করে বই খোঁজা ও

কাঙ্ক্ষিত বিষয় পেতে সমস্যা না হয়।

৮. উপহার দেওয়ার জন্য ভালো বইগুলোর একাধিক সংখ্যা সংগ্রহ রাখা।

৯. বই ধার দেওয়ার জন্য আলাদা একটা খাতা রাখা। যাতে করে সেখানে বইয়ের নাম ও যিনি ধার নিয়েছেন তার নাম লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়।

বই ধার দেওয়ার আদবসমূহ

বই ধার দেওয়া অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি কাজ। ইমাম ওয়াকী রাহ. বলেছেন, 'হাদীসের প্রথম বরকত হল বই ধার দেওয়া।'

[আদাবুল ইমলা ওয়াল ইসতিমলা : ১৭৪]

বই ধার দেওয়ার বেশ কিছু আদব ও শিষ্টাচার রয়েছে। যার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হল–

ক. ধার দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তার জন্য কল্যাণের দোআ করা। প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘ সময় বই নিজের কাছে রেখে না দেওয়া। মালিক বই ফেরত চাইলে তা আটকে না রাখা। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, মানুষের মাঝে বই ধার দেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হল, মালিকের কাছে বই ফেরত না দেওয়া। এবং কোন কারণ ও সমস্যা ছাড়াই বই ফেরত দিতে দেরি করা।

খ. ধার গ্রহীতার কর্তব্য হচ্ছে, যতো দ্রুত সম্ভব ধার নেওয়া বই ফেরত দেওয়া। এই বিষয়ে উলামায়ে

কেরামের কিছু বক্তব্য নিম্নরূপ–

* ইউনুস ইবনে যায়েদ বলেন, আমাকে যুহরী রাহ. বললেন, 'হে ইউনুস! বই আত্মসাৎ করা থেকে সাবধান।' তখন আমি বললাম, 'বই আত্মসাৎ কী?' তিনি বললেন, 'মালিকের কাজ থেকে বই আটকে রাখা।' [তাফসীরে কুরতুবী]

* খতীবে বাগদাদী রাহ. বলেছেন, বই আটকে রাখার কারণে অনেকেই ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।
[আল জামে লি আখলাকিল রাবি ও আদাবিস সামে ২/ ২৪৪]

* সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেছেন, তুমি নিজের বই কাউকে ধার দিও না। [প্রাগুক্ত, ২/২৪৪]

* রবি ইবনে সুলাইমান বলেন, বুওয়াইতি রাহ. আমার কাছে এই বলে পত্র পাঠালেন যে, তুমি নিজের বই হেফাজত করো। কারণ একটা বই যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে তুমি বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। [প্রাগুক্ত : ২/২৪৪]

বই ধার দেওয়ার বিষয়ে মধ্যম পন্থার দৃষ্টিভঙ্গি হল, আপনি কেবল তাদেরকে বই দিবেন যারা একে হেফাজত করে এবং যথাসময়ে ফিরিয়ে দেয়। একজন মনীষী বলেছেন, 'এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কাউকে বই ধার দিবেন না যে, যিনি ধার নিচ্ছেন তিনি জ্ঞানী ও দ্বীনদার মানুষ।'
[তাকয়ীদুল ইলম : ১৪৬]

তাদের কেউ কেউ এমন ছিলেন যে, যখন কোন মানুষ তার কাছে বই ধার চাইতো তখন তাকে বলতেন, তোমার বইগুলো আমাকে দেখাও। যদি দেখতেন তার নিজের বইগুলো সে সুন্দরভাবে হেফাজত করেছে তখন তাকে ধার দিতেন। আর যদি দেখতেন সেগুলো ধুলো-মলিন ও বিকৃত হয়ে আছে তাহলে দিতেন না।

[প্রাগুক্ত : ১৪৭]

কবি বলেছেন–

أَيُّهَا الْمُسْتَعِيْرُ مِنِّيْ كِتَابًا * إِنْ رَدَدْتَ الْكِتَابَ كَانَ صَوَابًا
أَنْتَ وَ اللّٰهِ إِنْ رَدَدْتَ كِتَابًا * كُنْتَ أَعْطَيْتَهُ أَخَذْتَ كِتَابًا

ওহে তুমি ধার করে বই যদি নাও ; ঠিক মতো সেই বই ফিরিয়ে ফের দাও। বিনিময়ে পাবে ধার আরো বহু বই; এই কথা জনে জনে আমি শুধু কই।

গ. মালিকের অনুমতি ছাড়া বইয়ের ভেতর কোন কিছু সংশোধন করতে যাবেন না। এবং বইয়ের শুরুতে ও শেষে খালি পৃষ্ঠাগুলোতেও কিছু লিখতে যাবেন না। তবে যদি বইয়ের মালিক এতে সন্তুষ্ট থাকেন অথবা অনুমতি দিয়ে থাকেন তবে ভিন্ন কথা। এমনিভাবে মালিকের অনুমতি ছাড়া সেটা অন্য কাউকে ধার দিবেন না। পানি, ময়লা ও ছিড়ে ফেলা থেকে বইকে হেফাজত করবেন।

ঘ. বই যিনি ধার নিবেন, তার কর্তব্য হচ্ছে বই নেওয়া ও

ফেরত দেওয়ার পূর্বে ভালোভাবে দেখে নেওয়া। যাতে করে বইটি অক্ষত ও সুরক্ষিত থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

পিডিএফ ভার্সনের বই

পিডিএফ বই বলতে বুঝানো হয় এমন বইকে, যা কম্পিউটারের স্ক্রীনে পড়া যায়।

আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমান যুগে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার হাত ধরে সাধারণভাবে প্রকাশিত বই-পুস্তকের পিডিএফ ভার্সনও পাওয়া যাচ্ছে। একটা ড্রাইভেই নতুন-পুরাতন অসংখ্য বই-পুস্তকের সংগ্রশালা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। যেগুলো কম্পিউটারের স্ক্রীনে ইলমী বিশ্বকোষ আকারে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। সেগুলো পড়া, অনুসন্ধান করা, প্রয়োজনীয় অংশ কপি করে রাখা ইত্যাদি নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। এসব কিছু মূলত পাঠক ও গবেষকদের জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণার রাস্তাকে সহজ করে দিচ্ছে। একজন গবেষক খুব সহজেই ইলমী প্রাচুর্যের অধিকারী হতে পারছেন। অসংখ্য বই-পুস্তক ও এমন সব তথ্য ভাণ্ডারের মালিক হতে পারছেন যা তিনি কখনো কল্পনাও করেন নি। এমনিভাবে বিশ্বের নানা প্রান্তের লাইব্রেরীগুলোতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলোও সামান্য কষ্টের বিনিময়ে তার হাতের নাগালেই পেয়ে যাচ্ছেন।

আপনি দেখবেন, বর্তমানে একজন গবেষক যদি কোন একট বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন করতে চান, সেই বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতামত সংগ্রহ করতে চান কিংবা জ্ঞানের নানান শাখা-প্রশাখার কোন একটি নিয়ে গবেষণা
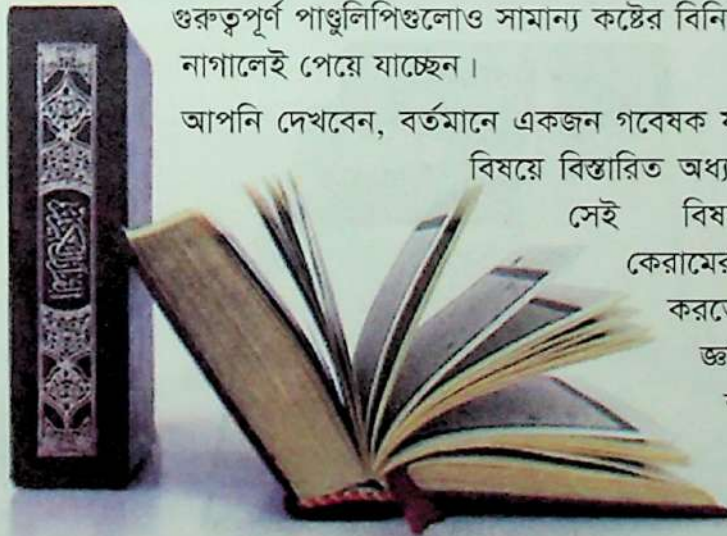
করতে চান, তাহলে বেশির চেয়ে বেশি যে কাজটি তাকে করতে হচ্ছে তা হল, ঘরে বা অফিসে অবস্থান করে অন্যান্য কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে ব্রেনকে ঝামেলা মুক্ত করে কম্পিউটারের স্ক্রীনের সামনে বসে পড়া। এরপর নিজের মতো যে কোন ইলমী বা অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানে নেমে পড়া। এটি তাকে এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করা, বড় বড় বইয়ের বোঝা বহন করা, প্রচুর পরিমাণে সময় ও শ্রম ব্যয় করার ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

এটা মূলত সৃষ্টিজীবের উপর আল্লাহ তাআলার একান্ত দয়া ও করুণা। ছাত্রদের জন্য তার পক্ষ থেকে ইলম ও জ্ঞান অর্জনের পথকে সহজীকরণ। সেই সাথে তাদের প্রতি অনুগ্রহ, যারা তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে শরীয়তের হুকুম-আহকাম জানার জন্য জ্ঞান অর্জনে সদা-সর্বদা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

আর আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। সুতরাং ছাত্রদের উচিত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা-শ্রমকে বিলিয়ে দেওয়া। এবং জ্ঞান অর্জনের যতো মাধ্যম রয়েছে সবগুলো গ্রহণ করা। যাতে করে বুঝা যায় যে, বই-পুস্তকের সাথে তার কোন বৈরিতা নেই। সেগুলার চেয়ে উত্তম কোন সাথী-সঙ্গী

নেই। অচেনা পরিবেশে সেগুলোর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ আর কেউ নেই।

উপসংহার

পূর্বের পুরো আলোচনার সারকথা হল, পড়ার ক্ষেত্রে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন হয়।

এক ধৈর্য ও প্রচেষ্টা। যাতে করে একজন মুসলমান ভালো ও অধ্যবসায়ী পাঠক হতে পারেন।

দুই. ইখলাস থাকা, যাতে করে পঠিত বিষয় থেকে উপকৃত হওয়া যায় এবং তার বক্ষে অর্জিত জ্ঞান স্থিতি লাভ করে ও এই কর্মের দরুন তিনি নেকি অর্জন করেন।

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, যাতে করে তিনি আমাদের উপকারী ইলম দান করেন এবং তা অর্জন করার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করেন। পঠিত বিষয় থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বোত্তম প্রার্থনা কবুলকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী।

وَاللّٰهُ الْهَادِيْ اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمْ

সমাপ্ত

নবী করীম সা. বলেন,

তোমরা আলকোরআনকে আঁকড়ে ধরো। কারণ ওই সত্তার শপথ যার হাতে এ মোহাম্মাদের প্রাণ, নিশ্চয় তা লাগামবাঁধা উট অপেক্ষা অধিক পলায়নপর।

(মুসলিম : ১৮৮০)

অর্থাৎ আবদ্ধ রাখতে উটকে যেমন লাগাম দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, তেমনি আলকোরআনকেও বেশি করে তিলাওয়াত ও গবেষণার মাধ্যমে আঁকড়ে ধরতে হবে। কারণ অবহেলাকারীদের থেকে খুব দ্রুত পালিয়ে যায় সে।

নবী করীম সা. বলেন,
আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির চেহারা উজ্জল করুন যে আমার কাছ থেকে কিছু শুনে তা হুবহু অন্যকে পৌছালো! কারণ যাদের কাছে পৌঁছানো হয় তাদের কেউ কেউ আমার কাছ থেকে শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক বোধগম্যকারী হবে।
(তিরমিযী : ২৬৫৭)